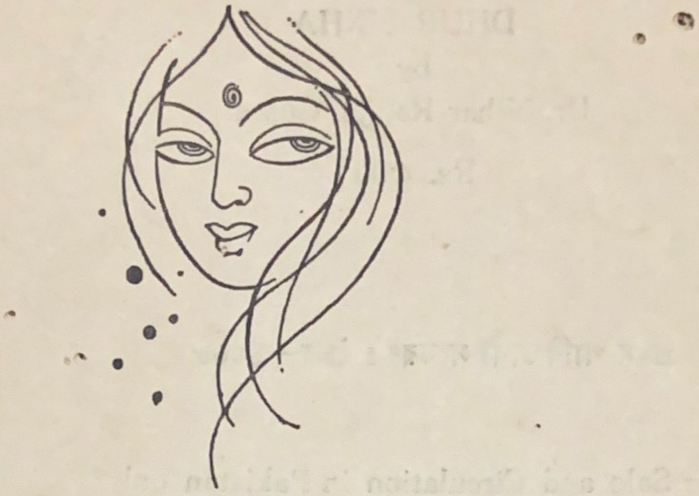

ধূপশিখা

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স লিমিটেড
৩/১০, লিয়াকত এভিন্যু (ভিক্টোরিয়া পার্ক) ঢাকা—১

DHUP SIKHA
by
Dr. Nihar Ranjan Gupta
Rs. 4·00

প্রথম পাকিস্তানী সংস্করণ ঃ চৈত্র—১৩৬৮

"For Sale and Circulation in Pakistan only"
"কেবলমাত্র পাকিস্তানে বিক্রয় ও বিতরণের জন্য"

প্রকাশক ঃ
রুহুল আমিন নিজামী
৩/১০, লিয়াকত এভিন্যু,
ঢাকা—১

মুদ্রাকর ঃ
নূরুল হক্
ডি-লাক্স প্রিণ্টারস,
৪৮, নারিন্দা রোড,
ঢাকা—১

॥ মূল্য ঃ চার টাকা মাত্র ॥

*

—চিত্র-পরিচালক চিত্ত বসু
বন্ধুবরেষু

*

প্রথম পর্ব

॥ এক ॥

হিমাদ্রি সহসা যেন কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল।

শুধু কি স্তব্ধই, চিঠির শেষাংটা পড়তে পড়তে সহসা যেন হিমাদ্রির সমস্ত মুখখানা ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠ্‌লো।

গৌরবর্ণ মুখখানা যেন অকস্মাৎ কেমন কালো হয়ে গেল।

চিঠির অক্ষরগুলো যেন জড়িয়ে জড়িয়ে কেমন ঝাপ্‌সা হয়ে এল।

মাথার উপরে পূর্ণ বেগে বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরছে, তবু মনে হয় যেন হিমাদ্রির, কোথায়ও এতটুকু হওয়া নেই।

নবজীবনের পথে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ জানিয়ে, বিবাহে না আসতে পারার দরুন দুঃখ জানিয়ে চিঠির শেষে লিখেছেন অমিয়মাধব ঃ

গরীব দুঃখীর যেয়ে হঠাৎ একই সঙ্গে মা-বাপ দুজনাকে হারিয়ে বিদেশ বিভুঁয়ে আশ্রয়হীনা হয়ে পড়েছিল তাই, আর স্বজাতি বলে ঘরে আশ্রয় দিয়েছিলাম।

কিন্তু মেয়েটা যে এতবড় নিমকহারাম, এতখানি নীচ দুশ্চরিত্র তা কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি।

যাক্, তবু যে আপদ শেষ পর্যন্ত নিজে থেকেই বিদায় হয়ে গিয়েছে সেজন্য ভগবানকে অজস্র ধন্যবাদ।

ছিঃ ছিঃ হারামজাদী শেষ পর্যন্ত কিনা এতবড় কেলেঙ্কারিটা করল!

এতকাল, বলতে গেলে সেই ওর যখন মাত্র নয় বৎসর বয়স, তখন থেকে ওকে নিজের মেয়ের মতই পালন করেছি তো!

তাই, যতই অপরাধ করুক তাড়িয়ে দেবো কেমন করে? পারতামও না। সত্যিই আমি বোধ হয় পারতাম না।

কিন্তু সে-সব কিছুই করতে হলো না। নিজে থেকেই চলে গেল।

আমি অবিশ্যি ধরতে পারতাম না।

তোর দিদিমার চোখেই ব্যাপারটা প্রথম ধরা পড়ে।

তুই এখান থেকে চলে যাবার মাস-দুই পরেই ব্যাপারটা ধরা পড়লো প্রথমে তোর দিদিমার চোখে।

কিন্তু ধরা পড়েও হারামজাদীর সে কি তেজ!

লজ্জা ঘেন্না পিত্তি কিচ্ছু নেই।

বলে কিনা তার গর্ভের সন্তানের মধ্যে নাকি কোন পাপ কোন অন্যায় নেই। গোপনে তার বিবাহ হয়েছে। এবং স্বামীর কাছে দেয় প্রতিশ্রুতি মতই নাকি সে স্বামীর নাম করতে পারছে না।

তার সেই কথা শুনে তোর দিদিমা তো ক্ষেপে আগুন।

তখুনি ঝেঁটিয়ে বাড়ী থেকে বের করে আর কি!

কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল হতভাগীর উপরে, তাই বললাম, ছেলেমানুষ যখন একটা অন্যায় করে ফেলেছেই—

মুখে আগুন! ছেলেমানুষ! ধেড়ে বিশ বছরের মাগী—বলে তোর দিদিমা যাচ্ছেতাই করতে লাগলেন। যাক্—শেষ পর্যন্ত পরদিন উঠে দিখি নিজেই চলে গিয়েছে।

অমিতার কণ্ঠস্বরে চমকে ফিরে তাকাল হিমাদ্রি।

কার চিঠি হিমাদ্রি?

স্নান সমাপনান্তে দামী একটা ঢাকাই শাড়ী পরে সিঁথিতে ডগডগে সিন্দূর দিয়ে ইতিমধ্যে নব-পরিণীতা স্ত্রী অমিতা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, হিমাদ্রি টেরও পায়নি।

অ্যাঁ—কিছু বলছিলে?

কার চিঠি?

চিঠি! কেমন যেন সহসা বিব্রত হয়ে পড়ে হিমাদ্রি।

তাড়াতাড়ি চিঠিটা ভাঁজ করতে করতে বলে, দাদুর চিঠি, হাজারিবাগ থেকে লিখেছেন।

কী লিখেছেন? দাদু যে আমাদের বিয়েতে এলেন না?

কাশী হরিদ্বার মথুরা বৃন্দাবন তীর্থ করতে গিয়োছলেন,

হাজারিবাগে ফিরে চিঠি দিয়েছেন।

চল না তোমার বিলেত যাবার আগে একবার হাজারিবাগ, দাছুর ওখান থেকে ঘুরে আসি!

তা বেশ তো, যাওয়া যাবে—

কথাটা বলে ধীরে ধীরে হিমাদ্রি ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

একটু নিরিবিল, একটু নির্জনতা চায় এখন হিমাদ্রি।

নীচের তালায় বাপের লাইব্রেরি ঘরে এসে ঢুকল।

দিন ছুই হলো একটা কেসে বাবা পাটনা গিয়েছেন।

নামকরা অ্যাড্‌ভোকেট হিমাদ্রির বাবা যতিশঙ্কর চৌধুরী।

যতিশঙ্করের ইচ্ছা তাঁর একমাত্র সন্তান, একমাত্র পুত্র হিমাদ্রিশঙ্কর তাঁরই প্রফেশন বেছে নেয়। তাঁর ইচ্ছানুযায়ীই আর দিন পনেরোর মধ্যে ব্যারিস্টারি পড়তে হিমাদ্রিশঙ্কর বিলেত রওনা হচ্ছে।

সব ব্যবস্থা পাকপাকি হয়ে গিয়েছে।

তীক্ষ্ণ মেধাবী ছাত্র হিমাদ্রি চিরদিন।

বরাবর সমস্ত পরীক্ষাতে বৃত্তি পেয়ে এসেছে।

নিজের ইচ্ছা ছিল ডাক্তার বা ইন্‌জিনিয়ার হয়, কিন্তু যতিশঙ্করের ইচ্ছা সে আইনজীবীই হয়, শেষ পর্যন্ত তাই বাপের মতকেই মেনে নিয়েছে হিমাদ্রি, বাপের মনে ছুঃখ দিতে পারেনি বলে।

হিমাদ্রির মা বিমলা অনেক আগেই গত হয়েছেন।

বাপের নির্জন লাইব্রেরি-ঘরটায় প্রবেশ করে হিমাদ্রি একটা চেয়ারের উপর বসল।

মাথাটার মধ্যে যেন কেমন করছে।

কিছুই যেন বুঝতে পারছে না হিমাদ্রি।

সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

একেবারে ভুলে গিয়েছিল বুঝি কথাটা হিমাদ্রি। ফিরে এসে এখানে অমিতাকে বিয়ে করে চলে গিয়েছিল গোপালপুর-অন্-সি। একটামাস সেখানে যেন অফুরন্ত একটা আনন্দের মধ্যে দিয়ে কেটে গিয়েছে।

কোন কথা ভাববারও যেমন অবকাশ পায়নি, তেমনি কোন কথা মনেও পড়েনি।

কিন্তু—

চেয়ারটার 'পরে হেলান দিয়ে চোখ বুজলো হিমাদ্রি।

'ছিঃ ছিঃ হারামজাদী শেষ পর্যন্ত কিনা এতবড় কেলেঙ্কারিটা করল।'

সত্যি বলছো তুমি আমাকে বিয়ে করবে ?

হ্যাঁ উমা, সত্যিই আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

আগুন জ্বেলে দিয়েছিল যেন উমা হিমাদ্রির মনে। হিমাদ্রি পাগল হয়ে উঠেছিল উমার জন্যে।

কিন্তু উমা কিছুতেই ধরা দিতে চায়নি।

ধরতে গেলেই সরে গিয়েছ।

বলেছ, না, ছিঃ!

কিন্তু মানুষের স্বভাবই হচ্ছে যা সহজে ধরা দেয় না সমস্ত মন সেই দিকেই ছোটে। মানুষকে বুঝি পাগল করে তোলে।

হিমাদ্রির মনের অবস্থাও তখন কতকটা তাই।

উমা, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না ?

প্রত্যুত্তরে ডাগর ছলোছলো দুটি চোখ তুলে নিঃশব্দে তাকিয়েছিল উমা হিমাদ্রির মুখের দিকে।

সে দৃষ্টি বুঝি বলতে চেয়েছিল, এখনো তোমার সংশয়!

ছলোছলো চোখের জল, অবাধ্য চোখের জল উপচে পড়তে চেয়েছিল।

দ্রুতপদে সেখানে থেকে, হিমাদ্রির চোখের দৃষ্টির সামনে থেকে, যেন পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল উমা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত উমাকে হিমাদ্রির বাহুবন্ধনে ধরা দিতেই হয়েছিল।

চিরকাল বিহারে চাকরি করেছেন অমিয়মাধব, তাই চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর বিহারেই স্থায়ী হয়েছিলেন।

একটি মাত্র মেয়ে বিমলা, মনের মত খুঁজে যতিশঙ্করের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তাকে। কিন্তু ভরা যৌবনে বিমলা সাজানো সংসার ফেলে চলে গেল।

সে দুঃখের ক্ষতটা অমিয়মাধব ও তাঁর স্ত্রী করুণাময়ীর বুক থেকে বুঝি কখনো মেলায়নি।

তাই বাংলাদেশে সমস্ত আত্মীয়স্বজন থাকলেও, চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তিনি আর বাংলাদেশে ফেরেননি।

হাজারিবাগ স্টেশন রোড থেকে মাইল দুয়েক দূরে বিঘে চারেক জমি কিনে একান্ত নিরিবিলিতে, যেন মানুষের সমাজ থেকে দূরেই, একটা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ী করে সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন স্বামী-স্ত্রী।

মস্তবড় বাড়ী, বাংলো প্যাটার্নের হলেও।

খান-ছয়েক ঘর। তাছাড়া মালীর ঘর, আউট-হাউস, গ্যারাজ—সবই ছিল।

একটি মাত্র ঘর নিয়ে অমিয়মাধব ও করুণাময়ী থাকতেন, বাকী ঘরগুলো সাজানো-গোছানো খালিই পড়ে থাকত।

একটি চাকর, মালী ও স্বামী-স্ত্রী ছাড়া থাকতো আশ্রিতা উমা।

শেষ চাকরি-জীবনে, পাটনায় থাকাকালীন সময়, একই রাত্রে কলেরাতে উমার মা-বাপ মারা যাওয়ায়, উমাকে দয়াপরবশ হয়ে গৃহে স্থান দিয়েছিলেন অমিয়মাধব।

উমার বাবা ছিলেন অমিয়মাধবেরই অধীনস্থ একজন কর্মচারী।

ন বছর বয়সের সময় উমা এসেছিল অমিয়মাধবের গৃহে। ওর মা-বাবা যখন মারা যান, তখন ওর বয়স মাত্র ন বছর।

ভারী শান্ত, নম্র স্বভাবের মেয়েটি।

মুখে কখনো একটি কথা নেই।

আপনা থেকেই যেন উমার পরে একটা অপত্যস্নেহ জন্মে গিয়েছিল স্বামী-স্ত্রীর।

ইচ্ছা ছিল একটি ভালো পাত্র দেখে উমার বিয়ে দেবেন। কিন্তু দেবো-দেবো করেও দেওয়া হয়ে ওঠেনি।

এমন সময় একদিন এম. এ. পাস করার পর, বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে যাবার যখন কথাবার্তা চলেছে, হিমাদ্রি এলো দাদু দিদিমার কাছে কয়েকটা দিনের জন্য হাজারিবাগ বেড়াতে।

চিরদিন শহুরে মানুষ, শহুরে চালচলনে অভ্যস্ত হিমাদ্রি, তাছাড়া শহরের অন্যতম ধনী পিতৃবন্ধুর কলেজে-পড়া বিদুষী মেয়ে অমিতার সঙ্গে কিছু পরিচয়ও আছে, তাই তারই সঙ্গে বিবাহের কথাবার্তা চলেছে। সেও সে কথা জানত। কিন্তু তবু ঐ কালো মেয়ে উমাকে দেখে প্রথম দৃষ্টিতেই যেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল হিমাদ্রি।

হিমাদ্রিকে দেখাশুনা ও তাকে যত্ন করার ভারটা করুণাময়ীই উমার 'পর দিয়েছিলেন।

সকালে বিকেলে চা-জলখাবার এনে দেয়, এটা ওটা আবশ্যক জিনিস হিমাদ্রির হাতের কাছে যুগিয়ে দেয় উমা। শান্ত নির্বাক মেয়েটি, হিমাদ্রি চেয়ে চেয়ে দেখে।

কাছে আসে সব সময়ই, তবু উমা কিন্তু কোন কথা বলে না হিমাদ্রির সঙ্গে।

অথচ হিমাদ্রির বেশ লাগে মেয়েটিকে।

একদিন বৈকালে চা দিতে এলে হিমাদ্রি বললে, আমার সঙ্গে তুমি কথা বলো না কেন উমা ?

উমা মাথাটা নিচু করে থাকে!

উমা!

বলুন।

বাঃ, এই তো বেশ কথা বলতে পার, বোবা তাহলে তুমি নও সত্যি সত্যিই!

হিমাদ্রি মৃদু মৃদু হাসে, কিন্তু সামান্য ব্যবধানে দাঁড়িয়ে পৌষের শীতেও ঘামতে থাকে উমা।

একদিন হিমাদ্রি বলে, সন্ধ্যাবেলা আজ আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে উমা ?

বেড়াতে ?

হ্যাঁ—

আমি ?

হ্যাঁ, তুমি ছাড়া আর কে !

কিন্তু আমি, আমি তো—কোথায়ও বের হই না।

কখনো বের হও না ?

না।

বেশ, আজ না হয় প্রথম বের হবে আমার সঙ্গেই—। শোনো, ঠিক পাঁচটার সময় বাড়ীর পিছন দিককার গেটের সামনে আমি অপেক্ষা করবো, সেখানে এসো। দুজনে রেললাইন ধরে বেড়াতে যাবো, কেমন ?

উমা হ্যাঁ বা না কোনো কথা না বলে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

বিকেলে নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে হিমাদ্রি দীর্ঘ দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করে, কিন্তু উমা আসে না।

হিমাদ্রি তখন একাই রেললাইনে ধরে হাঁটতে শুরু করে।

রাত্রে শোওয়ার আগে আবার দেখা হলো নির্জনে উমার সঙ্গে। জলের গ্লাসটা রাখতে এসেছিল উমা হিমাদ্রির শয়নঘরে।

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে হিমাদ্রি সিগারেট টানছিল, পদশব্দে ফিরে তাকাতেই দেখতে পেল উমাকে।

একেবারে সোজাসুজি প্রশ্ন, গেলে না যে ?

আমি—কি বলতে গিয়েও যেন বলতে পারে না উমা।

কথা জড়িয়ে যায়।

স্পষ্টাস্পষ্টি তখন বললেই পারতে যে, যাবে না।

আমি, আমিতো—

শুধু শুধু তোমার অপেক্ষায় আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমি তো কখনো বাড়ি থেকে বের হই না।

না হয় আজ বের হতেই।

বাবা, মা যদি রাগ করেন?

দাছ্ দিদিমা রাগ করবেন? কেন—আমার সঙ্গে গেলে রাগ করবেন কেন? বেশ আমি না হয় কাল বলবো—

না, না—বলতে হবে না—আমি, আমি—যাবো—

কাল তাহলে যাবে?

যাবো।

ঠিক!

হ্যাঁ—

পরের দিন রেললাইনের ধারে ছজনার দেখা হলো।

হিমাদ্রি হাত বাড়িয়ে উমার একটা হাত চেপে ধরে, বলে চল—

কিন্তু হাতটা ধরে একটু পরেই চলতে চলতে বুঝতে পারে হিমাদ্রি হাতটা উমার কাঁপছে, সেই শীতের সন্ধ্যাতেও যেন ঘামে ভিজে গিয়েছে একেবারে।

কাঁপছ কেন? ভয় করছে বুঝি? বোস, এইখানে বোস—

বেললাইনের ধারে ছজনে বসে একটা বড় পাথরের উপর। চারপাশে জংলী ঘাস আর আগাছা, ছোট ছোট লাল ফুল ফুটেছে সেই গাছগুলিতে।

ছজনে বসল পাশাপাশি কাছাকাছি।

উমা!

বলুন।

না, আপনি নয় তুমি!

হিমাদ্রির গায়ে দামী গরম জামাকাপড় ছিল, আর উমার গায়ে ছিল ছোট পাতলা একটা আলোয়ান।

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে আজ, সামান্য ঐ আলোয়ানটা গায়ে দিয়ে তোমার শীত করছে না উমা?

শীত আমার তেমন করে না।

যা কোল্ড তুমি, তোমার শীত করবে কি! মৃদু হেসে বলে হিমাদ্রি।

কিন্তু সত্যিই কি কোল্ড ছিল উমা? হিমাদ্রি ভাববার চেষ্টা করে।

শান্ত ধীর গতি ছিল তার, কথাবার্তাও খুব কম বলতো, কিন্তু তার দুটি চোখ, সেই চোখ দুটিই তো কথা বলতো।

তাছাড়া সেই শান্ত মেয়েটির মধ্যে ছিল অদ্ভুত দৃঢ় একটা আত্মমর্যাদার সংকল্প।

আর তাইতেই বুঝি মেয়েটিকে জয় করবার জন্য হিমাদ্রির অদ্ভুত একটা জিদ চেপে গিয়েছিল।

কিছুতেই উমা সেদিন যেন হিমাদ্রির কাছে ধরা দিতে চায়নি।

হিমাদ্রিও বুঝেছিল যোগ্য মর্যাদা না দিলে উমাকে সে পাবে না।

অথচ উমাকে তার চাই-ই।

॥ দুই ॥

সেদিন রাত্রে তাই হিমাদ্রির ঘরে জলের গ্লাসটা নিয়ে ঢুকতেই হিমাদ্রি এগিয়ে এসে উমার সামনে দাঁড়াল।

উমা!

কি?

আমি কি স্থির করেছি জানো উমা?

কি?

তোমাকে আমি বিয়ে করবো।

কথাটা অসম্ভবই নয় শুধু, অবিশ্বাস্য।

কেমন যেন বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে উমা হিমাদ্রির মুখের দিকে।

ঘরের কোণে টেবিলের 'পরে রক্ষিত টেবিল ল্যাম্পের আলোর খানিকটা উমার চোখে মুখে এসে পড়েছে।

মুখে কোনো প্রকাশ নেই, কিন্তু হিমাদ্রির মনে হলো যেন উমার চোখ দুটি এক অপ্রত্যাশিত আনন্দে মুহূর্তের জন্য চিকচিক করে উঠলো।

কি, অমন করে চেয়ে আছ কেন মুখের দিকে আমার? যা বললাম তা কি বুঝতে পারনি?

এবারে চোখের পাতা দুটো যেন আপনা হতেই বুজে আসে উমার।

বোজা চোখের পাতা দুটো কাঁপছে।

থির থির করে কাঁপছে।

উমা!

দুহাত বাড়িয়ে হিমাদ্রি উমাকে বুকে নেবার চেষ্টা করতেই অদ্ভুত কৌশলে সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হিমাদ্রির স্পর্শ থেকে যেন সামান্য একটু ব্যবধানে সরে দাঁড়ায়।

মৃদু কণ্ঠে শুধু বলে, না—

না? তুমি আমাকে তাহলে বিয়ে করবে না?

না।

কেন উমা?

এ বিয়ে তো হ'তে পারে না।

হ'তে পারে না! কেন হ'তে পারে না উমা?

তুমি কত বড়লোকের এক মাত্র ছেলে, আর আমি—

মৃদু হেসে হিমাদ্রি বলে, ও, এই কথা? কিন্তু আমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে তুমিও তো বড়লোক হবে?

তোমার বাবা, তোমার দাদু, দিদিমা—

তাঁদের জন্য তোমার ভাবতে হবে না। তাছাড়া এখন তো তাঁদের কাউকেই আমি জানাব না। বিয়ের পর জানাব।

জানাবে না!

না।

তবে?

সে ভারটা তুমি আমার 'পরেই ছেড়ে দাও। যা করবার আমিই করবো।

কিন্তু—

শোনো উমা, তুমি যা বলতে চাইছ সেটা একেবারে মিথ্যে নয়। তোমাকে বিয়ে করতে চাইলে সবাই ওরা আপত্তি জানাবে তাও আমি জানি। কিন্তু, বিয়ের পর যদি ওরা জানতে পারে তাহলে কিছু আর তোমাকে অস্বীকার করতে পারবে না। তাই আমি স্থির করেছি, বিয়ের পর সকলকে জানাব।

কথাগুলো বলে আবার হিমাদ্রি দুহাত বাড়ায় উমাকে ধরবার জন্য, কিন্তু এবারেও উমা সরে যায়।

পূর্ববৎ বলে, না—

উমা।

না—আগে আমাদের বিয়েটা হোক।

উমা আর দাঁড়ায় না।

ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

অনেক খুঁজে পুরোহিত হরিনাথ ভট্টাচার্যকে যোগাড় করে হিমাদ্রি এবং হরিনাথই এক রাত্রে তাদের বিবাহ দেয়।

আর সেই রাত্রে, তাদের সেই প্রথম মিলন-রাত্রেই, প্রথম ধরা দিয়েছিল উমা হিমাদ্রির আলিঙ্গনের মধ্যে নিজেকে।

কৌতুক করে সে রাত্রে বলেছিল হিমাদ্রি, আজ আর বুঝি আমার কাছে ধরা দিতে তোমার ভয় করছে না উমা?

না।

কেন?

আজ যে আমি তোমার স্ত্রী।

দুহাতে উমাকে বুকের মধ্যে নিবিড় করে ধরে হিমাদ্রি বলেছিল, শুধু আজ তোমাকে বিয়ে করেছি বলেই নয় উমা, জন্মে জন্মেই তুমি আমার স্ত্রী ছিলে, তাই আজও রইলে।

সে রাতটা যে কোথা দিয়ে শেষ হয়ে গিয়েছিল, দুজনার একজনও তা জানতে পারেনি।

শেষ রাতে উমা যখন ঘর থেকে বের হয়ে যায় হিমাদ্রি বলেছিল, আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা কিন্তু এখন আমি সম্পূর্ণ গোপন রাখতে চাই উমা। কেউ যেন না জানতে পারে।

কিন্তু—

ভয় কি! সময় হলেই সব আমি প্রকাশ করবো, কেমন?

উমা নিঃশব্দে ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানিয়েছিল।

পনেরো দিনে জন্য এসেছিল হিমাদ্রি, কিন্তু দুমাস কেটে গেল।

তারপর হঠাৎ একদিন কলকাতায় ফেরবার জন্য জরুরী তাগিদ দিয়ে যতিশঙ্করের চিঠি এলো।

উমাকে পেয়ে হিমাদ্রি বুঝি ভুলেই গিয়েছিল সব।

একটা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের মধ্যে যেন গা ভেসে চলেছিল।

ঠিক এমনি সময় অপ্রত্যাশিত একটা কালো ছায়ার মতই যেন ওদের আনন্দকে আড়াল করে দাঁড়াল হিমাদ্রির বাবা যতিশঙ্করের চিঠিটা।

যতিশঙ্কর চিঠি লিখছেন—

কল্যাণীয়েষু,

তোমার বিবাহের সব ঠিক করিলাম আমার বন্ধুকন্যা অমিতার সঙ্গে। অমিতাকে তো তুমি চেনই। আর ইহাও জানি, তাহাকে তোমার পছন্দ। আমাদের ইচ্ছা তোমার বিলাতযাত্রার পূর্বেই তোমাদের বিবাহের ব্যাপারটা চুকাইয়া দিব।

এবং সেই মতই সমস্ত ব্যবস্থা হইয়াছে।

সামনের ফাল্গুনের আট তারিখে বিবাহের দিন স্থির করিয়াছি। শ্বশুরমহাশয়কেও লিখিলাম। পত্রপাঠ আর বিলম্ব না করিয়া চলিয়া আসিবে। ইতি,

আশীর্বাদক
যতিশঙ্কর চৌধুরী

বাপের চিঠিটা পড়ে হিমাদ্রি যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়।

অমিতাকে সে চেনে।

পরিচয়ও আছে অমিতার সঙ্গে তার।

থার্ড ইয়ারের ছাত্রী অমিতা।

এবং অমিতার বাবা ও তার বাবার যে অনেক দিনকার ইচ্ছা তাদের বিবাহ হয়, সেও হিমাদ্রির অজানা নয়।

কিন্তু আজ সে উমাকে মন্ত্র পড়ে বিবাহ করেছে।

ব্যাপারটা সে গোপন করে রাখলেও আইনত এবং ধর্মত আজ উমাই তার স্ত্রী, একমাত্র স্ত্রী। এবং এক স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয়বার বিবাহের তার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

তবে কি সে বাবাকে সব কথা জানিয়ে চিঠি দেবে ?

জানিয়ে দেবে তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে ?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে, যে রকম রাশভারী এবং কঠোর নীতি-সম্পন্ন লোক তার বাবা যতিশঙ্কর, তার সে চিঠি পেলে হয়তো একটা অনর্থ ঘটিয়ে বসবেন।

শুধু কি অনর্থ ই, বিশ্রী একটা কেলেঙ্কারি হয়ে দাঁড়াবে।

তার চাইতে এখন কোনো কথা না জানানোই ভালো।

তাছাড়া চিঠিতে এসব কথা জানাবার চেষ্টা না করে সামনাসামনি গিয়ে ধীরে সুস্থে সব কথা জানানোই বোধ হয় বুদ্ধির কাজ হবে।

কিন্তু জানানো মানেই তো যতিশঙ্করের সামনে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ানো।

সত্যিই হিমাদ্রি যেন ভেবে কোন কূল পায় না।

সেদিম রাত্রে উমা যখন হিমাদ্রির ঘরে এলো, উমা দেখলো সে যেন কেমন অন্যমনস্ক।

প্রতি রাত্রে ঘরে এলে উমাকে আদর করে যেমন কাছে টেনে নিত তাও সেদিন সে নিল না।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা সিগারেটটাই পোড়াতে লাগল হিমাদ্রি।

পরে কোথায় ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত দুটো বাজল যখন, উমা তখন শয্যা থেকে উঠে এসে হিমাদ্রির পাশে দাঁড়াল। বললে, শোবে না ?

কে ? ও উমা, এখনো ঘুমাওনি তুমি ? যেন চম্‌কে ওঠে হিমাদ্রি।

কী হয়েছে তোমার ?

কই না, কিছু তো না !

কী হয়েছে বল না ?

সত্যি কিছু হয়নি।

সত্যি বলছো ?

সত্যি। চল শুই গে।

কিন্তু শয্যায় এসে শুলেও ঘুম আসে না হিমাদ্রির চোখে।

এবং জানতে পারে পাশে শুয়ে উমাও জেগে রয়েছে, কিন্তু তবু কেউ কোনো কথা বলে না।

হিমাদ্রি যেন সত্যিই ভেবে পায় না তার জীবনে উমার সমস্যা আজ সে কেমন করে মীমাংসা করবে।

বাবা। তার বাবা যতিশঙ্কর চৌধুরী।

বাবার মুখখানাই যেন বার বার হিমাদ্রির চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ছে।

কেমন করে সে সব কথা বাবাকে বলবে ?

কেমন করে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে ?

তবে কি উমাকেই সব কথা খুলে বলবে ?

না, না—কি প্রয়োজন এত তাড়াতাড়ি জট পাকানোর।

আর উমাকে এখন সব কথা বলেই বা কি লাভ হবে ? মিথ্যে শুধু তাকে চিন্তিতই করা হবে।

আবার মনে হয়—উমাকে নিয়ে সত্যিই কি সে সুখী হতে পারবে ? পাশাপাশি মনে পড়ে অমিতার চেহারাটা।

তার সেই যৌবন-ঢল-ঢল দীর্ঘ তনু। তার শ্যাম্‌পু করা চুল। কাজলটানা বাঁকা চোখের চাউনি।

তার সামনে যে জীবন তাকে হাতছানি দিচ্ছে সেখানে একমাত্র বধূবেশে তার পাশে এসে দাঁড়াতে পারে অমিতাই হয়তো।

তার ভাবী সুখের গৃহকে আনন্দ আর কলহাসি দিয়ে ভরিয়ে তুলতে পারে হয়তো একমাত্র প্রাণ-ঐশ্বর্যে ভরপুর অমিতাই।

উমা হয়তো সেখানে একান্তই বেমানান।

উমা কোনোদিনই হয়তো তার আভিজাত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে একসঙ্গে পা ফেলে চলতে পারবে না।

সেখানে সে পিছিয়ে পড়বে, হোঁচট্ খাবে।

মনে হয়, উমা শয্যাসঙ্গিনী হতে পারে, কিন্তু জীবনসঙ্গিনী হতে পারে না।

পরক্ষণেই মনে হয়, ছিঃ ছিঃ, এসব সে কী ভাবছে!

উমা তার স্ত্রী। ভালোবেসে তাকে সে বিয়ে করেছে।

একদিকে উমা। একদিকে অমিতা।

দুই নারী তার জীবনে। একজনকে বিদায় দিতেই হবে। কিন্তু কাকে সে বিদায় দেবে আজ?

উমার এতবড় বিশ্বাস, এতবড় ভালোবাসাকে সে কি তার প্রতারণার আঘাতে গুঁড়িয়ে দেবে? না, না,—সে, তা পারবে না।

ভাবতে ভাবতে তখন যেন কোনো কূলকিনারাই দেখতে পায় না হিমাদ্রি।

॥ তিন ॥

রাত বাড়তে থাকে ক্রমে।

নিশ্চিন্ত উমাও বুঝি কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু ঘুম এলো না হিমাদ্রির চোখে।

উমার সঙ্গে সে প্রতারণা করতে পারে না।

সরল বিশ্বাসে আর প্রাণঢালা ভালোবাসায় যে তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং পৃথিবীতে আজ যে হিমাদ্রিকেই একান্ত আপনার জন বলে জেনেছে তার সঙ্গে সে প্রতারণা করতে পারবে না।

কিন্তু তার বাবা যতিশঙ্কর ?

বাবাকে তার জানাতেই হবে বিয়ের কথা।

কিন্তু কেমন করে ?

কেমন করে দাঁড়াবে সে তাঁর সামনে গিয়ে ?

তিনি যদি বলেন, ও বিয়ে আমি স্বীকার করি না। তুমি বিয়ে করেছ যখন, তখন তোমার বিয়ে করা বৌকে নিয়ে যেখানে খুশি তুমি চলে যাও।

কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা—বাপের অবাধ্য আজ পর্যন্ত সে কোনোদিনও হয়নি। কখনো কোনো কারণেই সে তার বাপের মনে কষ্ট দেয়নি।

তার যখন মাত্র ছ বছর বয়স, যখন সে নিতান্ত বালক মাত্র—তখন তার মা মারা যান। তারপর থেকে বাবাই যে তাকে একাধারে মা ও বাবার স্নেহে মানুষ করে তুলেছেন।

কত জনে তাঁকে আবার বিয়ের কথা বলেছে কিন্তু কারও কোনো কথায় বাবা কান দেননি।

শান্ত হাসি হেসে বলেছেন, স্বর্গের লোভেও আমি আমার হিমুকে সৎমায়ের হাতে তুলে দিতে পারব না।

অচল অটল থেকেছেন তার বাবা।

এমন কি দাদু দিদিমাও একদিন অনুরোধ করেছিলেন, তুমি আবার বিয়ে কর যতি।

হিমাদ্রির বয়স তখন বছর দশেক হবে।

তার বাবার সেদিনকার জবাবটা কোনোদিনই ভোলেনি হিমাদ্রি।

যতিশঙ্কর জবাব দিয়েছিলেন, দেখুন, জীবনে একজন পুরুষ একজন নারীকে একবারই স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া, বিমলা

যে বিশ্বাসে তার একমাত্র সন্তানকে আমার হাতে মৃত্যুর সময় তুলে দিয়ে গিয়েছে সে বিশ্বাসকে যদি আমি ভঙ্গ করি তো অন্যের কথা দূরে থাক—আমার সন্তানের কাছেই যে আমি এ জীবনে আর মুখ তুলে দাঁড়াতে পারব না।

হিমাদ্রির চাইতে কে বেশী জানে যে, সেদিনের যতিশঙ্করের সে কথাগুলো কেবল মাত্র মুখের কথাই ছিল না।

তাঁর একমাত্র পুত্রের প্রতি যে নিবিড় স্নেহই তার প্রমাণ।

স্নেহ দিয়ে যেন সর্বক্ষণ ঘিরে রেখেছেন যতিশঙ্কর তাকে।

হিমু বলতে যতিশঙ্কর অজ্ঞান।

হঠাৎ হিমাদ্রির ঘুম ভেঙে গিয়েছে, ঘুমের চোখে দেখেছে শীতের রাত্রে হয়তো তার গায়ের লেপটা টেনে ঠিক করে দিচ্ছেন যতিশঙ্কর।

একটু গা গরম হলে বা সর্দি হলে সারারাত যতিশঙ্কর দুশ্চিন্তায় আর আশঙ্কায় হিমাদ্রির শয্যার শিয়রে বিনিদ্র কাটিয়েছেন।

কলেজ থেকে বা খেলার মাঠ থেকে ফিরতে একটু দেরি হলে গেটের সামনে তার অপেক্ষায় অধীরভাবে পায়চারি করেছেন।

পরীক্ষার সময় সে রাত জেগে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে যতিশঙ্করও রাত জেগেছেন।

সেই স্নেহময় বাপকে সে কেমন করে আঘাত দেবে?

কেমন করে তাঁর মুখের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে হিমাদ্রি স্পষ্টাস্পষ্টি বলবে, তাঁর মনোনীতা পাত্রীকে সে বিবাহ করতে পারবে না! উমাকে সে বিবাহ করেছে!

না, তা সম্ভব নয়।

তার চাইতে বরং সে কলকাতায় গিয়ে অন্য কোনো ভাবে বাবাকে ব্যাপারটা জানাবার চেষ্টা করবে।

বাবা তার অবুঝ নন।

হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু উমাকে এখন কিছু জানানো হবে না।

উমা যদি জিজ্ঞাসা করে কেন সে কলকাতার যাচ্ছে ?

কী জবাব দেবে সে উমার প্রশ্নের ?

সে যদি সঙ্গে যেতে চায় তার ?······

ভাবনায় ভাবনায় ক্রমে রাত ভোর হয়ে গেল।

নিত্যকার মত উমা শয্যা ত্যাগ করে চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এক সময়।

পরের দিন সারা সকালটাই সে ভাবল।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিল হিমাদ্রি পরের দিন, তার বাবা যে তার দাদু দিদিমাকে চিঠি দিয়েছেন লিখেছেন—সে চিঠি তখনো তাঁরা পাননি।

সমগ্র দ্বিপ্রহরটা ভাবলো হিমাদ্রি।

শেষে সন্ধ্যা নাগাদ ঠিক করলো সে চলে যাবে।

সেই দিনই সে কলকাতা রওনা হবে রাত্রের ট্রেনে।

কিন্তু কাউকে কিছু বলে যাওয়া হবে না।

এমন কি দাদু ও দিদিমাকেও না। কারণ দাদু ও দিদিমা জানতে পারলে উমাও জেনে ফেলবে।

তাছাড়া দাদু দিদিমা যখন এখনো ব্যাপারটা জানতে পারেননি তাঁদের না জানানোই ভালো।

রাত এগারোটায় ট্রেন।

সেদিন আবার দুপুর থেকেই আকাশ মেঘলা করে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি নেমেছে।

রাত নটার পর ঘরে ঢুকে স্যুট্‌কেশটা গুছিয়ে নিল হিমাদ্রি।

হিমাদ্রি জানতো উমা এখন ঘরে আসবে না। আসবে সেই রাত এগারোটার পর। এখন সে রন্ধনশালায় ব্যস্ত।

উমা ও দাদু দিদিমার নামে পৃথক পৃথক দুখানা চিঠি লিখলো। এবং উমার চিঠিটা তার নিজের ঘরে টেবিলের 'পরে একটা বই

চাপা দিয়ে তার পাশে দাহু দিদিমার চিঠিটাও চাপা দিয়ে রাখল।

কিন্তু ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে কি ভেবে যেন মত বদলালো। দাহুর ঘরে গিয়ে ঢুকল।

দাহু!

কে রে? হিমু—!

দাহু, আজ রাত্রের ট্রেনেই আমি কলকাতা চলে যাচ্ছি।

সে কি রে! সারা দিন বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ এই রাত্রে চললি-—

হ্যাঁ—হঠাৎই যাচ্ছি। বিশেষ একটা জরুরী কাজ আছে কালই কলকাতায়। একদম মনে ছিল না—

দিদিমা বাধা দিলেন, কিন্তু এই বৃষ্টির মধ্যে—

বৃষ্টিতে কি হয়েছে! আচ্ছা আমি চললাম—কথাটা বলে ওঁদের আর কোনোরূপ কথা বা প্রতিবাদ জানাবার অবকাশ মাত্রও না দিয়ে সোজা বের হয়ে গেল ঘর থেকে হিমাদ্রি।

দাহু ও দিদিমা যেন একটু চিন্তিতই হলেন।

কিন্তু খেয়ালী নাতিটিকে তাঁরা ভালো করেই চেনেন। তাই খুব বেশী বিস্ময় বা চিন্তার কারণ থাকে না তাঁদের।

উমা ছিল তখনো রান্নাঘরে, সে কিছুই জানতে পারল না।

পিছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে হিমাদ্রি রেললাইন ধরে হেঁটে চলে স্যুটকেশটা হাতে স্টেশনের দিকে হন হন করে।

বেশ বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নেমেছে তখন।

কনকনে হাওয়া বইছে।

॥ চার ॥

সে রাত্রে কী বৃষ্টি আর হাওয়া !

কোনোমতে সুটকেশটা হাতে হিমাদ্রি যখন দু মাইল দূরবর্তী স্টেশনে এসে পেঁাছল সর্বাঙ্গ তার ভিজে একেবারে সপ্‌সপ্‌ করছে। গায়ের গরম গ্রেট্‌ কোটটা থেকে টপ্‌ টপ্‌ করে জল ঝরে পড়ছে।

ছোট স্টেশন, ছোট ওয়েটিংরুম। খান-দুই মাত্র চেয়ার।

গা থেকে ভিজে গ্রেট কোটটা খুলে একটা চেয়ারে বসল হিমাদ্রি।

কিন্তু বেশীক্ষণ চেয়ারে বসে থাকতে পারে না।

একটা অব্যক্ত অস্বস্তিতে আবার এক সময় উঠে পড়ে। চঞ্চল পদে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে।

ভালো হলো না বোধ হয় কাজটা, মনে হয়।

উমাকে স্পষ্ট করে সব কথা খুলে বলে জানিয়ে এলেই হতো।

ওয়েটিংরুমের বদ্ধ কাচের শার্শির উপরে অধীর আক্ষেপে ধাক্কা দিচ্ছে এলোমেলো হাওয়া।

মনে হয় কে যেন বাইরে থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে বারবার সেই জানালার বদ্ধ কাচের শার্শিগুলোতে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে বলছে, খোল, খোল—

ঝম্‌ ঝম্‌ করে বৃষ্টির ধারা ঝরছে ছাদে।

ঘরের মধ্যে কেরোসিনের আলোর শিখাটা কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে।

হিমাদ্রি, হিমাদ্রি—

হাতঘড়িটার দিকে তাকাল হিমাদ্রি।

রাত এগারোটা বাজে, মাত্র দুমিনিট বাকী।

এগারোটা পাঁচে ট্রেন।

এখনি ট্রেন এসে পড়বে।

রাত এগারোটা।

এতক্ষণে উমার হয়তো কাজ শেষ হয়েছে, উমা হয়তো ঘরে এসেছে।

বেচারী! সবাই ঘুমোলে তবে সে চোরের মত পা টিপে টিপে তার ঘরে আসত। তার স্বামীর ঘরে।

আবার ভোর সাড়ে চারটায় ঘর থেকে বের হয়ে যেতো; যখন কারও ঘুম ভাঙ্গেনি।

কিন্তু ধারণাও করতে পারেনি হিমাদ্রি সেদিন রাতে ঠিক এগারোটায় নিত্যকার মত ঘরে পা দিয়েই উমার কি অবস্থা হয়েছিল।

বাইরে তখন ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

কাজ শেষ করে উমা ঘরে এসে ঢুকল।

বারান্দা দিয়ে আসতে আসতেই জলের ছাটে তার শাড়ি ভিজে গিয়েছিল।

ঘরের মধ্যে পা দিয়েই কিন্তু থম্‌কে দাঁড়াল উমা।

ঘরে হিমাদ্রি নেই।

এত রাত্রে এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় গেল হিমাদ্রি?

আশ্চর্য! রাত্রে তো কখনো সে ঘর থেকে বাইরে যায় না। বিশেষ করে এই জল বৃষ্টির মধ্যে!

নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি উমার বুকের ভিতরটা অজানা একটা আশঙ্কায় ধ্বক্ করে ওঠে।

এদিক-ওদিক একবার ঘরের মধ্যে অসহায় দৃষ্টিতে যেন তাকায় উমা।

উমা কেমন যেন বিপন্ন বোধ করে নিজেকে। নজর পড়ে শয্যাটার উপর। নিভাঁজ শয্যাটা।

কেউ স্পর্শ করেনি।

শুনছ! ক্ষীণকণ্ঠে ডাকে উমা।

কিন্তু কারও কোন সাড়া পায় না।

আবার বাইরে বের হয়ে আসে উমা। অন্ধকার বারান্দাটা বৃষ্টির ঝাপ্‌টা এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে।

কনকনে হাওয়া বইছে।

ফিরে আসে আবার ঘরের মধ্যে।

কী ওটা? কাঁপা হাতে তুলে নেয় ভাঁজকরা কাগজটা উমা টেবিল থেকে।

কাঁপতে কাঁপতে ভাঁজ খোলে কাগজটার।

আলোর সামনেও প্রথমটা চিঠির সব লেখাগুলো কেমন যেন ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা মনে হয়।

উমা,

হঠাৎ কলকাতায় চলে যাচ্ছি। চিন্তা করো না। শিগ্‌গিরই ফিরছি!

—হিমাদ্রি।

সংক্ষিপ্ত, মাত্র একটি লাইনের চিঠি।

কাঁপতে কাঁপতে হাত থেকে চিঠিটা মাটিতে পড়ে যায়।

কতক্ষণ বিহ্বল পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলো উমা।

হিমাদ্রি, হিমাদ্রি চলে গিয়েছে।

কিন্তু কেন? কেন—চলে গেল?

তারপরেই হঠাৎ কী যেন মনে হলো উমার, পাগলের মতই ঘর থেকে বের হয়ে, সেই অবিশ্রাম বৃষ্টিধারার মধ্যে, অন্ধকারে পিছনের গেট দিয়ে লাইনের ধারে এসে পড়ল উমা।

লাইনের ধার দিয়ে ছুটতে লাগল।

পাগলের মতই ছুটতে লাগল উমা।

অসমতল রাস্তা, পাথরের নুড়িতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে পা, কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, ছুটছে তবু উমা।

ছুটতে ছুটতেই একসময় নজরে পড়লো ঐ দূর থেকে অন্ধকার ভেদ করে আসছে একটা তীব্র আলো।

গম গম্ শব্দ একটা।

ইস্পাতের রেল-লাইন দুটো কাঁপছে। গম-গম-গম্ শব্দ তুলে ট্রেন আসছে।

দেখতে দেখতে ট্রেনটা আরও কাছে এসে যায়।

খট্ খট্ খটাং খটাং—প্রচণ্ড একটা শব্দ তুলতে তুলতে ট্রেনটা আসছে।

আলোটা তীব্র আরো তীব্র—চোখ ধাঁধিয়ে দেয় যেন উমার।

গুরুগম্ভীর একটা সিটি দেয় ইঞ্জিনটা।

ট্রেনটা আরো কাছে এসে যায়।

দেখতে দেখতে একেবারে উমার পাশ দিয়ে ইঞ্জিনটা বের হয়ে যেতে থাকে।

চীৎকার করে ওঠে উমা, হিমাদ্রি, হিমাদ্রি—

চলন্ত ট্রেনের চাকার শব্দে ঘটাং ঘটাং শব্দে একটি মেয়ের সে চীৎকার কোথায় তলিয়ে যায়।

হারিয়ে যায়।

কামরার বন্ধ শার্শির ওপাশ থেকে আলো এসে জলে ভেজা উমার মুখের উপর পড়ে আর সরে যায়, পড়ে আর সরে যায়।

উমা পাগলের মতই যেন চলন্ত ট্রেনটার সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে ছুটতে ডাকে, হিমাদ্রি, হিমাদ্রি, হিমাদ্রি।

হিমাদ্রি শুনতে পায়নি উমার সেই করুণ ডাক সে রাত্রের।

ঠিক সেই সময় সে স্যুট্‌কেশ থেকে আর এক প্রস্থ জামা কাপড় বের করে তোয়ালে দিয়ে ভিজে চুলগুলো মুছে, চিরুনি দিয়ে আঁচড়াচ্ছিল।

আর মনে মনে ভাবছিল, কাজটা কি ভালো হলো?

উমাকে সব কথা জানিয়ে এলেই হয়তো ভাল হতো!

এক সময় বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে একটা কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছিল হিমাদ্রি।

কিন্তু শুয়ে পড়লেও ঘুমোতে পারেনি সে রাত্রে হিমাদ্রি।

কেবল ভেবেছে, উমাকে সব কথা খুলে না জানিয়ে এভাবে চলে আসাটা তার বোধ হয় ভালো হয়নি।

উমা হয়তো ভেবে ভেবে কূল পাবে না।

আর ভেবেছে সেই সঙ্গে বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কিভাবে কথাটা বলবে।

বাড়ীতে পূর্বে কোনো সংবাদ না দিয়ে আসায় সেদিন হিমাদ্রিকে ট্যাক্সিতে করেই বাড়ী আসতে হয়েছিল।

ট্রেনটা প্রায় ঘণ্টাখানেক লেট ছিল।

নীচের পারলারের সামনের করিডর দিয়ে দোতলার সিঁড়ির দিকে যেতে হয়। দোতলার সিঁড়ির দিকেই এগুচ্ছিল হিমাদ্রি।

হিমাদ্রি জানত না যে, সে সময় পারলারে বসে যতিশঙ্কর অমিতার বাবার সঙ্গে কথা বলছিলেন।

হিমাদ্রির জুতোর শব্দ যতিশঙ্করের কানে যেতেই তিনি ঘরের ভিতর থেকে প্রশ্ন করেন, কে?

তখন আর কোনই উপায় নেই যতিশঙ্করকে এড়িয়ে যাওয়ার।

অগত্যা হিমাদ্রিকে থামতেই হলো এবং সাড়াও দিতে হলো, বাবা, আমি—

কে, হিমু, এসো, এসো—

পায়ে পায়ে গিয়ে হিমাদ্রি পারলারে প্রবেশ করে যতিশঙ্করের সামনে দাঁড়াল।

যতিশঙ্কর ও তাঁর বন্ধু অমিতার বাবা সিদ্ধার্থ রায় পাশাপাশি দুটো সোফায় বসে ছিলেন।

ভোরের ট্রেনেই এলে বুঝি?

হ্যাঁ।

চিঠি পেয়েছো তো?

হ্যাঁ।

সিদ্ধার্থ আমাকে কী বলছিল জান, আজকালকার ছেলেমেয়ে, কথাটা পাকাপাকি করবার আগে তোমার মতামতটা জেনে নিতে। আমি তো শুনে হেসে বাঁচি না—

বাবা—

জানি, আমি জানি। আমার ছেলেকে আমি জানি না ? আমি কথা দিলে তুমি যে তা ফেলতে পার না, সে আমি জানি বলেই পাকা কথা দিয়েছি।

বাবা—

তাছাড়া অমিতাকে তো তুমি চেন। পরস্পর তোমরা পরস্পরের পরিচিত— আর এও আমি জানি, you like her। যাও, তুমি ট্রেনজার্নিতে পরিশ্রান্ত। Have rest।

অসহায় দৃষ্টিতে বাপের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে উদ্যত হয় হিমাদ্রি।

হ্যাঁ, ভালো কথা, শোন, চিঠিতে তোমাকে সব কথা খুলে জানাতে পারিনি। সামনের মাসের আটই বিয়ের দিন ঠিক করেছি আমরা।

হিমাদ্রি চলতে চলতে থেমে দাঁড়িয়েছিল। আবার পা বাড়ায়।

হ্যাঁ আর একটা কথা, আজ সকালেই আমি অমিতাকে আশীর্বাদ করতে যাচ্ছি। সিদ্ধার্থও আজই বেলা চারটেয় আসবে তোমাকে আশীর্বাদ করতে—

আবার মনে পড়লো যেন উমাকে হিমাদ্রির।

সারাটা রাত চলন্ত ট্রেনের লোয়ার বার্থ টায় শুয়েও দুশ্চিন্তায় বিনিদ্রই কেটেছে হিমাদ্রির।

আর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে একবার উমার সরল বিশ্বাসে আর প্রেমে সুন্দর মুখখানা আর একবার তার পাশেই যতিশঙ্করের মুখখানা।

উমা।

সে মুখেও যেমন স্নেহ ও নিশ্চিন্ত বিশ্বাস, তেমনি বাবার মুখেও।

দুখানি মুখ, চার জোড়া চোখ যেন সারাটা রাত হিমাদ্রির মুখের দিকে চেয়ে ছিল।

কিন্তু এখন অসহ্য একটা যন্ত্রণায় মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে।

কোনোমতে ঘর থেকে বের হয়ে সিঁড়ি অতিক্রম করে দোতলায় নিজের ঘরে এসে ঢোকে হিমাদ্রি।

কিন্তু এখনো সে চুপ করে আছে কেন?

এখনো যতিশঙ্করকে সব কথা সে খুলে বলছে না কেন?

বলতেই যে হবে। তাকে বলতেই যে হবে।

হাত-মুখ ধোয় না, জামা-কাপড়ও ছাড়ে না হিমাদ্রি। যে জামা-কাপড় গায়ে ট্রেন থেকে এসে নেমেছিল সেই জামা-কাপড় নিয়েই একটা চেয়ারে যেন স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

অসহ্য যন্ত্রণায় যেন মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে।

ভৃত্য এসে চা খাবার দিয়ে গেল।

কিন্তু অভুক্তই পড়ে রইলো সে খাবার, চায়ের কাপ যেমন তেমনি।

কিন্তু বলতে যে হবেই তাকে।

উঠে দাঁড়াল বাবার কাছে যাবার জন্য। কিন্তু ঘর থেকে বেরুতেই ভৃত্যের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল।

ভৃত্য শুধোয়, বাথরুমে কি গরম জল দেবো দাদাবাবু?

গরম জল! দে। হ্যাঁরে, বাবা কোথায়? তাঁর ঘরে?

আজ্ঞে না, বাবু তো গাড়ি নিয়ে কখন বার হয়ে গিয়েছেন।

বেরিয়ে গিয়েচেন?

হ্যাঁ, বৌদিমণিকে আশীর্বাদ করতে গিয়েচেন।

হাসতে হাসতে ভৃত্য কথাগুলো বলে।

॥ পাঁচ ॥

ঘণ্টা দেড়েক পরে। হিমাদ্রি স্নান করে জামা-কাপড় ছেড়ে তার নিজের ঘরে একটা আরাম কেদারার 'পরে গা এলিয়ে দিয়ে পড়েছিল।

সত্যিই যেন হিমাদ্রি আর ভাবতে পারছিল না।

অন্ধ নিয়তিই যেন তাকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে অমোঘ কঠিন এক আকর্ষণে।

ক্রিং, ক্রিং—ক্রিং।

পাশের ঘরে ফোনটা বেজে ওঠে।

চাকরই ফোন ধরেছিল এবং একটু পরে এসে বললে, দাদাবাবু, কে আপনাকে ফোনে ডাকচে।

কে আবার এ সময় ফোনে ডাকে?

অনিচ্ছা ও বিরক্তির সঙ্গেই এগিয়ে গিয়ে ফোনটা তুলে নিল হিমাদ্রি, হ্যালো।

কে? হিমাদ্রি? মেয়েলী কণ্ঠে প্রশ্ন ভেসে এলো।

হ্যাঁ—

কি ব্যাপার, চিনতে পারচো না নাকি, আমি অমিতা।

অমিতা!

চমকে ওঠে যেন হিমাদ্রি।

শুনেচো নিশ্চয়ই সব কথা। তোমার বাবা এসেছিলেন, এই মাত্র চলে গেলেন। জানো কাল রাত্রে তোমাকে স্বপ্ন দেখছিলাম। আর আজ ঘুম ভাঙ্গার পর থেকেই মনে হল যেন কতদিন তোমাকে দেখি না। অনেকদিন—আজ এসো না একবার।

আজ?

হ্যাঁ—

আজ থাক অমিতা, আজ শরীরটা বড্ড ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে বুঝি?

হ্যাঁ।

তবে থাক?

ফোনটা নামিয়ে রেখে হিমাদ্রি ঘরে এসে আবার বসল। সব কিছু যেন হিমাদ্রির কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

একটা অন্যায়, একটা পাপকে সত্যি সত্যিই প্রশ্রয় দিচ্ছে নাকি হিমাদ্রি!

এক ধর্মপত্নী বর্তমানে দ্বিতীয়বার বিবাহের তার কোন অধিকার নেই। অন্যায়ই নয় শুধু, এ যে পাপ। মহাপাপ।

উমাকে স্বেচ্ছায় সে বিয়ে করেছে।

উমা তো কোন অপরাধে অপরাধী নয়। তবে, তবে—এতবড় একটা অন্যায়কে মুখ বুজে প্রশ্রয় দিতে চলেছে সে কেমন করে?

প্রতিবাদ জানানোরও কি কোন শক্তি তার নেই?

অথচ কথাটা তার বাবাকে জানাবার জন্যই না তাড়াতাড়ি ছুটে এলো হিমাদ্রি হাজারীবাগ থেকে।

তবে বলতেই বা পারছে না কেন?···

যতিশঙ্কর এসে ঘরে ঢুকলেন।

সামনের আটই ফাল্গুন তোমাদের বিয়ের তারিখ ঠিক করে এলাম।

বাবা!

কিছু বলছিলে?

হ্যাঁ, বলছিলাম বিলেত থেকে ফিরে এসে বিয়ে করলে হতো না!

কেন?

না, এমনিই বলছিলাম!

না, আমার ইচ্ছা তুমি বিয়ে করেই বিলেত যাও। তারপর যতিশঙ্কর যেন একটু ভাবলেন এবং ভেবে বললেন, তুমি চলে গেলে এই এত বড় বাড়িতে আমি তো টিকতে পারবো না। অমিতা থাকলে তবু এক রকম করে কাটিয়ে দিতে পারবো। যাক্, মনে আছেতো চারটার সময় সিদ্ধার্থ আসবে তোমাকে আশীর্বাদ করতে?

অসহায় দৃষ্টিতে হিমাদ্রি অতঃপর কেবল একবার যতিশঙ্করের মুখের দিকে তাকাল।

যতিশঙ্কর ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

একমাত্র ছেলের বিবাহ দিতে চলেছেন যতিশঙ্কর।

শুধু কি একমাত্র ছেলেই! তার মার মৃত্যুর পর থেকে তাকে নিয়েই তো বেঁচে আছেন যতিশঙ্কর।

তাঁর সমস্ত স্নেহ দিয়ে তাকে সর্বদা ঘিরে রেখেছেন।

তাকে ঘিরে যতিশঙ্করের যে কতখানি আশা, কতখানি কল্পনা তা তো হিমাদ্রির অজানা নয়।

আজ যদি সে ঐ যতিশঙ্করকে গিয়ে বলে, এ বিয়ে সে করতে পারবে না! সে বিয়ে করে এসেছে হাজারীবাগে একটি মেয়েকে। সে আঘাত কি যতিশঙ্কর সামলাতে পারবেন?

এতবড় আঘাতটা কেমন করে সে দেবে বাবাকে?

এ যে তার পক্ষে কল্পনাতীত।

না, পারবে না হিমাদ্রি।

কিছুতেই তা সে পারবে না।

বাবাকে এতবড় আঘাতটা সে কিছুতেই দিতে পারবে না।

কিন্তু উমা?

উমাও তো কোন অপরাধ করেনি। তাকেই বা তাহলে সে এতবড় আঘাতটা দেবে কি করে?

উমার কথাই ভাবতে ভাবতে হিমাদ্রির চোখে কখন যে এক সময় সুপ্তির বিস্মৃতি নেমে আসে নিজেও বুঝি তা সে জানতে পারে না।

সারাটা রাত ট্রেনে একটিবারের জন্যেও দুটি চোখের পাতা এক করতে পারেনি হিমাদ্রি।

চোখ দুটো জ্বালা করছিল।

চোখের পাতা দুটো ঘুমে ভারী হয়ে এসেছিল।

ঘুমিয়েই পড়ে হিমাদ্রি।...

ঘুম ভাঙ্গে একেবারে যতিশঙ্করের ডাকে, হিমু, হিমু—

কে! ধড়মড় করে উঠে বসে হিমাদ্রি।

তুমি এখনো ঘুমচ্ছো, সিদ্ধার্থ কখন থেকে এসে বসে আছে—পুরুত মশাই এসে তাগাদা দিচ্ছেন, সময় চলে যাচ্ছে আশীর্বাদের। যাও, তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে নিচে এসো।

যতিশঙ্কর ছেলেকে প্রস্তুতির তাগিদ দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

মাঘ মাস।

তবু আকাশটা সেদিন দুপুর থেকেই যেন কেমন মেঘাচ্ছন্ন হয়েছিল।

মধ্যে মধ্যে টিপ্ টিপ করে দু এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছিল।

আশীর্বাদ গ্রহণ করা মানেই এই বিবাহ তাকে স্বীকার করে নেওয়া।

কি করবে এখন হিমাদ্রি?

এখনো কি সে চুপ করেই থাকবে?

বাবাকে সে কিছুই বলবে না?

হিমাদ্রি কেমন যেন অসহায়, নিঝুম হয়ে বসেই থাকে।

উমা, উমা—এখন আমি কি করবো বলে দাও।

তবে কি সে পালিয়েই যাবে? কিন্তু তারপর! তাকে যখন খুঁজে কোথাও পাওয়া যাবে না, তার বাবার এতবড় উঁচু মাথাটা কি তাঁর বন্ধুর সামনে হেঁট হয়ে যাবে না?

বাবা যতিশঙ্করের উঁচু মাথাটাকে নিচু করে দেবার তো কোন অধিকারই তার নেই!

এখানে এসে সে কি করলে!

হুট্ করে এখানে একেবারে চলে না এসে সেখান থেকে একটা চিঠি লিখে যতিশঙ্করকে সব জানালেই তো হতো।

সামনাসামনি দাঁড়িয়ে তো তাকে অন্তত কোন জবাবদিহি করতে হতো না।

অথচ জানানোও হতো যতিশঙ্করকে ব্যাপারটা।

ভাল করে না ভেবে-চিন্তে এসে কি করে বসল একটা।

এখন এগিয়ে যাবারও যেমন কোন যুক্তি নেই, তেমনি পিছিয়ে যাবারও কোন উপায় নেই।

একদিকে উমা আর একদিকে তার বাবা যতিশঙ্কর।

একদিকে তার বিবাহিত স্ত্রী—তার প্রতি কর্তব্য, তার প্রতি ন্যায়নিষ্ঠা—অন্যদিকে তার জন্মদাতা স্নেহময় বাপ, যিনি এতকাল

পরম বিশ্বাসে ও আশ্বাসে তারই মুখের দিকে চেয়ে রয়েছেন, বাক্যদান করেছেন তাঁর বন্ধুকে।

একি হিমু! এখনো বসে আছো!

যতিশঙ্করের কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে হিমাদ্রি।

ওঁরা যে কতক্ষণ থেকে তোমার অপেক্ষায় বসে আছেন।

যতিশঙ্কর ছেলের বিলম্ব দেখে আবার ঘরে এসে ঢুকেছেন। কোনমতে ঢোঁক গিলে চোখ-কান বুজেই হিমাদ্রি এবার বলে, বাবা!

কি?

বাবা, আমার একটা কথা ছিল।

॥ ছয় ॥

শুনবো, সব শুনবো—এদিকে সময় চলে যাচ্ছে—এসো তাড়াতাড়ি।

যতিশঙ্কর আর দাঁড়ালেন না।

ছেলেকে তাগিদ দিয়ে ঘর থেকে, যেমন এসেছিলেন তেমনি বের হয়ে গেলেন।

অনন্যোপায় মুহ্যমানের মতই যেন হিমাদ্রি উঠে পড়ল। ঘর থেকে বের হয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমেছে, মনে হলো হিমাদ্রির কে যেন পিছন থেকে ক্ষীণ অনুনয়ভরা কণ্ঠে ডাকছে, কোথায় যাচ্ছো?

কে!

কোথায় যাচ্ছো হিমাদ্রি?

সিঁড়ির নিচেই যতিশঙ্কর এসে আবার দাঁড়িয়েছেন, কই হিমাদ্রি এসো—এসো, এসো।

ধাপের পর ধাপ নেমে এলো হিমাদ্রি।

আশীর্বাদ হয়ে গেল।

হীরের আংটি দিয়ে আশীর্বাদ করে গেলেন ভাবী জামাইকে সিদ্ধার্থ রায়।

সেই দিনই রাত্রে।

যতিশঙ্কর তাঁর শয়ন ঘরে একটা আরাম-কেদারার উপর বসে একটা জরুরী মামলার নথি পড়ছিলেন, পায়ে পায়ে এসে হিমাদ্রি ঘরে ঢুকল।

বাবা।

কে! হিমু? এসো—

বাবা, একটা কথা বলছিলাম—

বল। দাঁড়িয়ে কেন, বোস—

বলছিলাম বিলেত থেকে ফিরে এসে যদি বিয়ে করতাম।

যতিশঙ্কর কেদারা থেকে উঠে পড়েন। তারপর কয়েকবার ঘরের মধ্যে পায়চারি করলেন।

দেখ হিমাদ্রি, কথা তাহ'লে তোমাকে আমি খুলেই বলি। তাছাড়া আমারও কেবল মনে হচ্ছিল কথাটা তোমাকে আমার খুলে বলা কর্তব্য—

বাবা!

তোমাকে আমি একটা কথা আজ পর্যন্ত বলিনি, আমার জীবনে সমস্ত সঞ্চয় বছর দুই আগে একটা কারবারের মধ্যে ঢেলেছিলাম। অবশ্য জেনেই ঢেলেছিলাম যে স্পেক্যুলেশ্যনটা রীতিমত রিস্কি হচ্ছে। তবে তুমি তো জান যত বড়ই রিস্ক হোক, কোন একটা ব্যাপারে কখনো একবার মন স্থির করলে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে আমি বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করিনি কখনো আজ পর্যন্ত জীবনে। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছিল। কিন্তু আনফরচুনেটলি আই ফেইল্ড্ দিস টাইম। এবং যখন ফেল করলাম—

যতিশঙ্কর যেন দম নেওয়ার জন্যই একটু থামলেন।

বিহ্বল অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল হিমাদ্রি তখন যেন বাবা যতিশঙ্করের মুখের দিকে।

কিন্তু যতিশঙ্করের মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না।

ঘরের মধ্যে যে বিরাট শেডে ঢাকা স্ট্যাণ্ডের উপর আলোটা জ্বলছিল সেই আলোয় দণ্ডায়মান যতিশঙ্করের মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না।

কেবল দেখা যাচ্ছিল নাইট-গাউনে আবৃত দেহের নিম্নাংশ ও স্লিপার পরিহিত দুখানি পা।

যতিশঙ্কর আবার তখন বলতে শুরু করেছেন, এবং ফেল করার পর যে কথাটা আমার প্রথম মনে হলো, জীবনে ইতিপূর্বে রিস্ক নিতে গিয়ে দু চারবার যখন হেরেছি তখন যে বয়সটা ছিল—সামনে তখনো যে সময় ছিল—তার দুটোর একটাও আজ আমার নেই। বয়সও নেই, সময়ও নেই, অর্থও নেই। অথচ এখনো একটা বিরাট কর্তব্য আমার সামনে। হ্যাঁ, তুমি। তোমাকে এখনো উপযুক্ত করে দাঁড় করিয়ে দিতে পারিনি।

হিমাদ্রি যেন স্তব্ধ হয়ে যতিশঙ্করের কথাগুলো শুনতে থাকে।

যতিশঙ্কর বলতে থাকেন, দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। ইয়েস্, আই ওয়াজ বিউইলডার্ড। ঠিক সেই সময় আমার বাল্যবন্ধু সিদ্ধার্থ এগিয়ে এলো তার প্রোপোজাল নিয়ে। তার একমাত্র মেয়ে অমিতার সঙ্গে তোমার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। সেই মুহূর্তেই বুঝেছিলাম, আমাদের সকলের উপর সহজ বুদ্ধির অগোচরে যে এক শক্তি থাকে এ সেই শক্তিরই করুণা! অন্য সময় হলে হয়ত তোমাকে জিজ্ঞাসা না করে কোন কিছু একেবারে স্থির করতাম না, কিন্তু সে সময় ভাববারও যেন এতটুকু অবকাশ আমার ছিল না। আমি যেন বেঁচে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করলাম। তাছাড়া আমি তো জানতাম সিদ্ধার্থর মেয়ে অমিতাও তোমার পরিচিত এবং তাকে তুমি পছন্দও কর। তবু বলবো—সিদ্ধার্থর প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ—কারণ সে তার প্রস্তাবের দ্বারা আমায় ছোট করেনি—আমার লায়াবেলিটিটা

কেবল আমারি পাশে দাঁড়িয়ে পার্টনার হয়ে ভাগ করে নিয়েছে।

হিমাদ্রি।

স্তব্ধ, বোবা হয়ে থাকে হিমাদ্রি যেন অতঃপর।

কোন কথাই যেন তার আর মুখে যোগায় না।

জীবনের কত বড় লজ্জাকে যে আজ যতিশঙ্কর তাঁর ছেলের কাছে ব্যক্ত করলেন এবং কত দুঃখে—সেটুকু বুঝতে হিমাদ্রির তো দেরি হয় না।

যতিশঙ্কর আবার বললেন, তোমার কাছে সব বলতে পেরে সত্যিই আমি যেন আজ মুক্তি পেলাম।

হিমাদ্রি নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

বলা হলো না তার আর কোন কথাই।

উমার কথা আর বলা হলো না তার বাবাকে।

যতিশঙ্করের মুখের দিকে চেয়ে কিছুতেই আর যেন তার মুখ দিয়ে উমার কথাটা বের হলো না।

মাথা নিচু করে তাই হিমাদ্রি যতিশঙ্করের ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

হিমাদ্রির মনে অমিতা তাদের স্বল্প পরিচয়ে বিশেষ কোন রেখাপাত করেনি সত্যি, কিন্তু অমিতার মনে হিমাদ্রি সত্যিই রেখাপাত করেছিল।

সে ব্যাপারটা পরের দিন সকালে সর্বপ্রথম জানতে পেরেছিল হিমাদ্রি।

ইতিপূর্বে দু একবার হিমাদ্রিই গিয়েছে অমিতাদের বাড়ি, অমিতা কিন্তু আসেনি।

অমিতা প্রথম এলো পরের দিন সকালে অর্থাৎ আশীর্বাদের পরের দিন।

এবং কথাটা জানতে পারল হিমাদ্রি সেদিন অমিতার মুখের দিকে চেয়েই।

খুশিতে অমিতা যেন সেদিন ঝলমল করছিল।

তুমি!

একটা কথা বলতে এলাম। অমিতা বলে।

কি?

তাগিদটা কিন্তু আমিই বাবাকে দিয়েছিলাম!

তুমি?

হ্যাঁ।

কেন?

কেন আবার কি? তোমাকে না হলে যে আমার চলতো না।

হিমাদ্রি চুপ করে থাকে।

আটই ফাল্গুন তারপর বিয়ে হয়ে গেল।

এবং বিয়ের পর তুজনে মধুচন্দ্রিকা যাপন করতে চলে গেল গোপালপুর-অন-সি।

সেখানে একটা মাস কোথা দিয়ে কেটে গিয়েছে—যেন পাখা মেলে এই একটা মাস উড়ে গিয়েছে।

কলকাতায় ফিরেছে মাত্র সাত দিন হলো।

আর পাঁচটি দিন বাকী।

সামনের শুক্রবার বিলাতের পথে পাড়ি দিচ্ছে হিমাদ্রি। সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে।

'ছিঃ, ছিঃ, হারামজাদী শেষ পর্যন্ত কিনা এতবড় কেলেঙ্কারিটা করল!'

বাঃ, তুমি এখানে এসে বসে এই লাইব্রেরীর মধ্যে, আর সারা বাড়ি তোমাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি।

কে? ও অমু! চমকে মুখ তুলে তাকায় হিমাদ্রি।

॥ সাত ॥

কি ব্যাপার ?

কি ব্যাপার মানে। মার্কেটে যাবে না ?

মার্কেটে— ?

বাঃ, তোমার বাকী জিনিসপত্রগুলো কিনতে হবে না ?

এ বেলা না হয় থাক অমু। বিকেলে না হয়—

বিকেলে যাবে কখন শুনি ? ছোটমাসীর ওখানে আজ আমাদের ডিনারের নিমন্ত্রণ আছে না ? সন্ধ্যের আগেই যেতে বলেছে। চল, চল—ওঠো, আর দেরি করো না।

অমিতার মুখের দিকে তাকালো হিমাদ্রি।

ইতিমধ্যেই বাইরে বেরুবার মত সাজ হয়ে গিয়েছে অমিতার।

আকাশনীল রঙের ঢাকাই শাড়ি ও গাঢ় লাল ভেলভেটের ব্লাউজটায় কিন্তু চমৎকার মানিয়েছে অমিতাকে।

হর্স-টেল করে চুল বেঁধেছে একটা সাদা রিবন দিয়ে।

মুখে রুজ, ঠোঁটে লিপস্টিক্, ভ্রূতে রঙ, নিখুঁত প্রসাধন। অনেক সুন্দর অমিতা।

হাসলে তার গালের টোলটি, দাঁড়াবার ভঙ্গিটি, কথা বলার সুরটি —সব, সব সুন্দর।

কোথায় অমিতা আর কোথায় উমা।

কোন প্রসাধন নেই, অত্যন্ত সাদামাঠা। অমন মেঘের মত কালো চুল কোন দিন বাঁধতে দেখেনি উমাকে হিমাদ্রি।

উমা এসব জানেও না।

কি বিশ্রী গন্ধ নারকেল তেল যে চুলে দিত উমা !

আর অমিতা। অ্যাটকিনসন হেয়ার অয়েলের মাস্কের গন্ধটা কী মিষ্টি !

উমা গৃহকোণে সলজ্জা, অস্তিত্ব নেই যেন কোন—আর অমিতা সমস্ত গৃহ যেন উজ্জ্বল করে রেখেছে তার দীপ্তিতে, হাস্যে, লাস্যে।

চকিতপ্রেক্ষণা অমিতা আর আশ্রমদুহিতা উমা।

দাদু লিখেছেন ঃ

'মেয়েটা যে এতবড় নিমকহারাম, এতখানি নীচ দুশ্চরিত্রা, কল্পনাও করতে পারিনি।'

'যাক্, তবু যে আপদ শেষ পর্যন্ত নিজে থেকে বিদায় নিয়ে গিয়েছে—ভগবানকে অজস্র ধন্যবাদ!'

'ছিঃ ছিঃ, হারামজাদী শেষ পর্যন্ত কিনা এত বড় কেলেঙ্কারিটা করল!'

কি হলো, উঠবে না? আবার তাড়া দেয় অমিতা।

য়্যা! চমকে ওঠে হিমাদ্রি। বলে, হ্যাঁ, চল—

চলন্ত গাড়িতে বসেও যেন হিমাদ্রি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে।

দাদু লিখেছেন ঃ 'লজ্জা, ঘেন্না, পিত্তি কিছু নেই। বলে কিনা তার সন্তানের মধ্যে নাকি কোন পাপ নেই। গোপনে তার বিয়ে হয়েছে।'

কোথায় যেন সানাই বাজছে।

ভারী মিষ্টি সানাই।

গাড়িতে করে যেতে যেতেই নজরে পড়ে হিমাদ্রির, বড় রাস্তার উপরেই একটা বাড়িতে বিবাহ-উৎসব, লাল সালু দিয়ে গেটের 'পরে মাচা বেঁধে রোশনচৌকি বসিয়েছে, সানাই বাজছে।

দাদু লিখেছেন ঃ 'গোপনে তার বিবাহ হয়েছে। এবং স্বামীর কাছে দেয় প্রতিশ্রুতির মতই নাকি সে স্বামীর নাম করতে পারছে না।'

আঃ, একটা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয় হিমাদ্রি।

শেষ পর্যন্ত তাহ'লে উমা তার নাম করেনি।

কিন্তু—

তবু কি আশ্চর্য, সেই ডাগর ডাগর ছলো-ছলো দুটো চোখ যেন

মনের পাতায় বার বার ভেসে ওঠে হিমাদ্রির।

বিয়ে তো তোমাকে করেছি উমা, তবু অমন ভয়ে ভয়ে আমার মুখের দিকে তাকাও কেন বল তো।

হিমাদ্রির কথায় উমা মাথা নিচু করেছিল।

কি হলো, কই মুখ তোল!

তবু তাকাবে না উমা হিমাদ্রির মুখের দিকে।

হাত দিয়ে থুতনিটা তুলে ধরতেই নজরে পড়ে, ত্ব'চোখের কোল বেয়ে তুটি অশ্রুর ধারা।

কাঁদছো?

কই, না তো।

হ্যাঁ, ঐ যে তোমার চোখে জল! উমা!

কি?

একটা কথার সত্যি জবাব দেবে?

কি?

তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো না? বল উমা—তু'হাতে উমার মুখখানা বুকে টেনে নেয় হিমাদ্রি।

ভীরু কপোতীর মত কাঁপে তবু উমা হিমাদ্রির বুকের মধ্যে।

কই জবাব দিলে না?

আমি যে তোমার যোগ্য নই।

কে বললে?

কে আবার বলবে, আমি জানি না বুঝি, বুঝি না বুঝি?

যোগ্য না হলে কি তোমাকে বিয়ে করতাম?

সত্যি বলছো?

সত্যি।

কি হয়েছে তোমার বল তো?

আবার অমিতার কথায় যেন চমকে ওঠে হিমাদ্রি।

কই না, কি হবে?

তবে তখন থেকে অমন ঝিম্ মেরে আছো কেন? শরীর খারাপ হয়নি তো?

না, না—

কই চিঠিটা আমাকে পড়ালে না তো।

চিঠি! চমকে ওঠে হিমাদ্রি, কার চিঠি?

কেন, দাদুর চিঠি।

ও, হ্যাঁ—বাড়িতে গিয়ে পড়ে শোনাব।

গ্যাখো, একটা কথা ভাবছিলাম হিমাদ্রি।

কি?

যাবে নাকি দাদুর ওখানে?

চম্‌কে ওঠে যেন সহসা অমিতার কথায় হিমাদ্রি।

য়্যাঁ, কি বললে?

চম্‌কে উঠলে যে অমন করে?

না, না—বলছিলাম, এখন আর যাবার সময় কোথায়?

কথাটা বলতে বলতে আবার যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায় হিমাদ্রি।

মনে হচ্ছে এখনো যেন দূর থেকে সানাইয়ের সুরটা ভেসে আসছে।

ড্রাইভারকে অকারণেই হঠাৎ ধমকে ওঠে হিমাদ্রি, কি গরুর গাড়ির মত চালাচ্ছ সর্দারজী! একটু জোরে চালাও না গাড়ি।

সর্দারজী যেন একটু বিস্মিতই হয়। ছোটবাবু চিরদিন মধ্যম গতিতে গাড়ি চালাবার পক্ষপাতী।

সে বলে, কাহে ছোটাবাবু, তিশ মাইল স্পিড্ হ্যায়—

অমিতাও একটু অবাক হয়েই যেন স্বামীর মুখের দিকে তাকায়।

শুধু তাই নয়, মার্কেটে অমিতার সঙ্গে মার্কেটিং করতে করতে কেবলই তাড়া দেয়, হয়েছে, হয়েছে চল—শেষ করে নাও তাড়াতাড়ি।

চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে যে অস্বস্তিটা ভিতরে ভিতরে এতক্ষণ হিমাদ্রিকে পীড়ন করছিল সেটাই যেন প্রকাশ হয়ে পড়তে থাকে।

কি হয়েছে তোমার বল তো?

গাড়িতে এসে বসে অমিতা আবার স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করে।

কি আবার হবে?

নিশ্চয়ই হয়েছে, সেই সকাল থেকেই কেমন কেমন যেন তোমায় দেখছি।

বিশেষ কিছু না, মাথাটা যেন কেমন একটু ধরেছে।

তা সে কথা আগে বলনি কেন? এই গরমে তাহ'লে আর বেরোতাম না।

হিমাদ্রি আর কোন জবাব দেয় না।

গাড়ির জানালাপথে রাস্তার জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকে।

উমা চলে গিয়েছে! সেই হারামজাদী, নিমকহারাম, নীচ, দুশ্চরিত্রা মেয়েটা।

কিন্তু কোথায় গেল!

তার মত ঘরকুনো মেয়ে রাস্তায় বের হলো কোন্ সাহসে!

দুনিয়ায় তো কেউ তার নেই সে জানে। মা বাপ আত্মীয় ভাই বন্ধু—কেউ নেই।

স্বামী থেকেও নেই।

মনে পড়ে আবার দাদুর চিঠির একটা অংশ। উমা সন্তান-সম্ভাবিতা।

সন্তান। তারই সন্তান আজ উমার গর্ভে।

মাথাটার মধ্যে কেমন যেন ঝিমঝিম করে।

গাড়ির পিছনে হেলান দিয়ে চোখ বোজে হিমাদ্রি।

আশ্চর্য!

উমা যে সন্তানসম্ভাবিতা হতে পারে এতদিন একবারও সে কথাটা মনে হয়নি তার।

কিন্তু মনে হলেই বা কি হতো!

কি করতো সে!

পাশেই উপবিষ্টা অমিতার দিকে তাকালো হিমাদ্রি।

অমিতা আজ তার স্ত্রী।

কিন্তু উমা? উমাও কি তার স্ত্রী নয়! তাকেও কি সে পবিত্র বেদ-মন্ত্র পাঠ করে বিবাহ করেনি! তাছাড়া ধর্মত আইনত উমাই কি তার যথার্থ স্ত্রী নয়!

এক স্ত্রী বর্তমানে অমিতার সঙ্গে বিবাহ আজও হিন্দু আইনে অপরাধ নয়। কিন্তু আজ যদি উমা আদালতে এসে দাঁড়িয়ে দাবি জানায়, সেই তার স্বামী, তখন?

তখন কি জবাব দেবে সে?

আর অমিতাকেই বা সে কি বলবে?

তারপর তার প্রতি অমিতার কি আর কোন বিশ্বাস, কোন শ্রদ্ধা থাকবে?

কেবল কি অমিতাই? তার আত্মীয়স্বজন, পরিচিত কেউ কি আর তাকে ক্ষমার চোখে দেখবে?

দাছু, দিদিমা! তাঁরা—তাঁরাই বা কি বলবেন!

বলবেন হয়ত, হিমু, তোর এই কাজ!

তাছাড়া বাবা।

যতিশঙ্কর আজ নিশ্চিন্ত।

সমস্ত জীবন হিমাদ্রির সামনে পড়ে আছে। বিলেত যাচ্ছে সে, ব্যারিস্টার হয়ে ফিরবে।

যশ মান খ্যাতি অর্থ।

সে কি নির্বোধ না উন্মাদ যে এতবড় অবিমৃশ্য কাজ সে করবে! তাছাড়া উমা তো চলেই গিয়েছে।

নিজে থেকেই তো চলে গিয়েছে।

দাহু তো লিখেছেনই—'যাক্, তবু যে আপদ শেষ পর্যন্ত নিজে থেকেই বিদায় নিয়ে গিয়েছে—ভগবানকে অজস্র ধন্যবাদ।'

সত্যিই ভগবানকে অজস্র ধন্যবাদ।

কোটি কোটি ধন্যবাদ।

আপদ বিদায় হয়েছে।

আপদই তো। উমা আজ তার জীবনে আপদ ছাড়া আর কি!

॥ আট ॥

উমা প্রথমে ভেবেছিল যেমন করেই হোক কলকাতায় গিয়ে হিমাদ্রিকে খুঁজে বের করবে।

হিমাদ্রির দাদুর মুখেই একদিন সে হিমাদ্রির কলকাতার ঠিকানা শুনেছিল।

ঠিকানা খুঁজে ঠিক সে বের করতে পারবে!

আর খুঁজে যদি বের করতে পারে হিমাদ্রিকে তাহ'লে সে একটি কথাই জিজ্ঞাসা করবে, আজও তাকে সে স্ত্রী বলে স্বীকার করে কি না।

আর সেই সংকল্প নিয়েই সে অমিয়মাধব ও করুণাময়ীর আশ্রয় ত্যাগ করে চলে এসেছিল।

করুণাময়ী যখন বলছিলেন, ওরে হতভাগী, তোকে যে আমি নিজের সন্তানের মতই ভালবেসেছিলাম, বিশ্বাস করে আশ্রয় দিয়েছিলাম, সেই তুই কিনা শেষ পর্যন্ত এমন করে আমার মুখটা পোড়ালি! —তখন ইচ্ছা হয়েছিল চীৎকার করে সে বলে, মুখ আমি পোড়াইনি মা, মুখ তোমার আমি পোড়াইনি। তোমার আদরের নাতির বিবাহিতা স্ত্রী আমি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বলতে পারেনি উমা।

মাথা নিচু করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সব অপবাদ মেনে নিয়েছিল।

সমস্ত কলঙ্ক মাথায় তুলে নিয়েছিল।

তাছাড়া বললেই কি করুণাময়ী সেদিন তার কথা বিশ্বাস করতেন?

মাত্র কুড়িটি টাকা আঁচলে বেঁধে এককাপড়ে পিছনের বাগানের দরজা দিয়ে উমা রাত্রির অন্ধকারে বের হয়ে এসেছিল।

অমিয়মাধব ও করুণাময়ীর নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

রাস্তায় এসে দাঁড়ানো ছাড়া তো সমাজে সংসারে সেদিন তার আর দ্বিতীয় কোন পথও ছিল না।

আটই ফাল্গুন বিয়ে হয়ে গেল।

এবং বিয়ের ঠিক পরদিনই হিমাদ্রি অমিতাকে নিয়ে গোপালপুর-অন-সি হনিমুনে চলে গিয়েছিল। তারপর যেদিন আবার তারা কলকাতায় ফিরে এলো একমাস বাদে, ঠিক তার পরদিন প্রত্যূষে উমা—অসহায় একটি মেয়ে—কলকাতা শহরে এসে স্বামীর সন্ধানে পা দিয়েছিল।

হিমাদ্রিকে খুঁজে বের করবার জন্য উমা কলকাতায় পৌঁছে খুঁজে খুঁজে নির্দিষ্ট ঠিকানার উদ্দেশে পা বাড়িয়েছিল।

হিমাদ্রি, হিমাদ্রির সঙ্গে যে দেখা তার করতেই হবে।

কোনোদিন পথে বের হয়নি।

বাইরের জগতের সঙ্গে কোনো পরিচয় নেই তার।

তবু আশ্চর্য, পা কিন্তু তার কাঁপেনি।

স্বামীর কাছে চলেছে সে, ভয় কি তার!

নির্ভয়েই সে পা বাড়িয়েছিল বাইরে, অন্ধকার রাত্রে।

টিকিট কেটে কলকাতাগামী ট্রেনেও উঠেছিল।

কিন্তু রাত যত শেষ হয়ে আসতে থাকে, ট্রেনটা যত কলকাতার কাছাকাছি আসতে থাকে, অনিশ্চয়তায় আর আশঙ্কায় বুকটা তত যেন কাঁপতে থাকে উমার।

কোথায় চলেছে সে!

হিমাদ্রির কাছে, তার স্বামীর কাছে; কিন্তু কে তার স্বামী, কে হিমাদ্রি, যে হিমাদ্রি তাকে বিবাহ করেও চোরের মত পালিয়ে গিয়েছে?

তার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে অনায়াসে তার মাথায় চাপিয়ে গিয়েছে এক দুরপনেয় কলঙ্কের বোঝা।

সেই স্বামী, সেই হিমাদ্রির কাছে সে ছুটে চলেছে!

কিসের আশায় ছুটে চলেছে?

তাকে স্ত্রী বলে গৃহে স্থান দেবে, তার গর্ভের সন্তানকে বুকে তুলে নেবে?

কিন্তু আজ যদি সে বলে, কে তুমি, তোমাকে আমি চিনি না!

কেউ তো উমাকে বিশ্বাস করবে না।

কেউ তো তার দাবিকে সত্য বলে মেনে নেবে না।

তবু, তবু হাওড়া স্টেশনে নেমে হেঁটে হেঁটে খোঁজ করতে করতে গিয়ে উমা একসময় হাজির হয়, বেলা দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রতাপে ঝলসে পুড়ে ক্লান্ত হয়ে, হিমাদ্রির বাড়িটার সামনেই।

বিরাট বাড়ি, বিরাট লোহার গেট।

গেটটা বন্ধ।

বন্ধ গেটটার সামনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে উমা।

গেটটার ওপাশে দেখা যাচ্ছে লাল সুরকি-ঢালা পথ, দু'পাশে মেহেদীর কেয়ারি।

অজস্র মরশুমী ফুলের বর্ণ-বৈচিত্র্য।

কৃত্রিম ফোয়ারা থেকে ঝর ঝর করে জল ঝরছে।

গেটের গায়ে শ্বেতপ্রস্তরফলকে নাম লেখা—যতিশঙ্কর চৌধুরী—অ্যাডভোকেট।

ঐ লোহার গেট অতিক্রম করে উমা অন্দরে প্রবেশ করতে এসেছে?

নিজের পরিধেয় জীর্ণ মলিন শাড়িটার দিকে তাকালো উমা।

উমা, ভিক্ষুক উমা, তোর তো স্পর্ধা কম নয়! কোথায় এসেছিস তুই! কোথায় ঢুকবি, ঐ প্রাসাদে?

ফ্যাল ফ্যাল করে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে উমা লোহার গেটটার দিকে।

রোদ ঝিমিয়ে আসে, বেলা পড়ে যায় একসময়, তবু গেটের একপাশে গুণ্ঠন টেনে দাঁড়িয়ে থাকে উমা বুঝি নিশ্চল পাথরের মতই।

অমিতাকে সঙ্গে নিয়ে হিমাদ্রি অমিতাদের ওখানে সকালেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিল।

অপরাহ্ণ বেলায় হিমাদ্রি আর অমিতা গাড়িতে করে যখন ফিরছে তখনও ঠায় একপাশে দাঁড়িয়ে উমা।

ড্রাইভার সর্দারজী গাড়ির হর্ণ দিতেই দারোয়ান ছুটে এসে গেট খুলতে যায়, একপাশে উমাকে দেখে খিঁচিয়ে ওঠে, এই হটো—হটো হিঁয়াসে—

নিজের অজ্ঞাতেই অমিতার পাশে উপবিষ্ট হিমাদ্রির গেটের সামনে দণ্ডায়মান উমার প্রতি নজর পড়ে যায়। যেন ভূত দেখার মত চম্‌কে ওঠে হিমাদ্রি।

গেটের একটা পাল্লায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল উমা। তারও ইতিমধ্যে হিমাদ্রি ও অমিতার ওপর নজর পড়েছিল।

দুই চোখের দৃষ্টি মেলে ওদের দেখছিল উমা।

হিমাদ্রির পাশে ও কে?

মাথায় সিঁদুর, কপালে সিঁদুর—সর্বাঙ্গে ঝলমল করছে অলঙ্কার। পরিধানে দামী শাড়ি!

দারোয়ান আবারও খিঁচিয়ে ওঠে, এই হটো, হটো হিঁয়াসে—

উমা আর হিমাদ্রি তখনো দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে।

অমিতাই এবারে শুধোয়, কৌন হ্যায় দারোয়ান, কেয়া মাংতা হ্যায়?

কোই ভিখ্‌মাংগা মালুম হোতা হ্যায় বহুজী।

অমিতা তার ব্যাগের ভিতর থেকে একটা নোট বের ক'রে দারোয়ানের দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বলে, দে দো—

দারোয়ান টাকাটা তুলে নিয়ে উমাকে দিতে যায় কিন্তু উমা যেন পাথর। বোবা।

এই নাও। —দারোয়ান বলে।

উমার কিন্তু সাড়া নেই।

দারোয়ান খিঁচিয়ে ওঠে, এই মাগী—

অকস্মাৎ যেন ধারালো তীরের খোঁচা এসে লাগে হিমাদ্রির বুকে। নিজের অজ্ঞাতেই চীৎকার করে ওঠে হিমাদ্রি দারোয়ানকে প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে, এই হারামজাদা শুয়ার কাঁহাকা—

পার্শ্বে উপবিষ্টা অমিতা চম্‌কে ওঠে স্বামীর সেই চীৎকারে।

দারোয়ানও চম্‌কে ওঠে।

আচ্ছা তরে সে বাত্‌ করো!

উমা কিন্তু ততক্ষণে সেখান থেকে সরে গিয়েছে।

এই দারোয়ান, গেট খোল। —আবার চেঁচিয়ে ওঠে হিমাদ্রি।

দারোয়ান গেট খুলে দেয়।

ড্রাইভার গাড়ি ভিতরে চালিয়ে দেয়।

গাড়ি গেট দিয়ে ঢুকে পোর্টিকোর নিচে এসে দাঁড়ায়।

আগে হিমাদ্রি নেমে পড়ে।

তার পিছনে অমিতা।

॥ নয় ॥

মাথাটার মধ্যে যেন কেমন করছিল হিমাদ্রির।

অমিতার দিকে যেন আর তাকাতেও পারে না সে।

স্খলিতপদে নিচের লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে ঢোকে।

কেবলই মনের পর্দায় ভেসে ওঠে উমার দুই চোখের সেই স্থির অকম্পিত চাহনি।

উমা। উমা—

হঠাৎই বের হয়ে আসে হিমাদ্রি লাইব্রেরী ঘর থেকে এবং সোজা গেটের দিকে এগিয়ে যায়।

গেট দিয়ে বের হয় রাস্তায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তখন চারিদিকে।

উমা। উমা—

কিন্তু কোথায় উমা।

রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত তাকিয়ে দেখে হিমাদ্রি।

কিন্তু উমা তো নেই।

উমা। উমা—

প্রায় ঘণ্টা-দুই তবু এ রাস্তা থেকে ও রাস্তা ঘুরে ঘুরে এক সময় ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে ফিরে আসে হিমাদ্রি।

সিঁড়ির মুখেই অমিতার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

কোথায় গিয়েছিলে ?—অমিতা শুধোয়।

এই একটু, মানে বাইরে। —কেমন যেন থতমত খেয়ে জবাব দেয় হিমাদ্রি।

বাইরে কোথায় ?

এই—। চল ওপরে।

হিমাদ্রি অমিতাকে যেন আর কোন কথা বলারই অবকাশ দেয় না।

পাশ কাটিয়ে তরতর করে উপরে উঠে যায়।

একটু যেন অবাক হয়েই চেয়ে থাকে অমিতা স্বামীর গমনপথের দিকে।

চলতে গিয়েও কিন্তু উমা চলতে পারে না।

সারাদিনের অনাহার তো বটেই, তারপর সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অবিরাম হাঁটা এবং অপরাহ্ণ পর্যন্ত একই ভাবে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকা,—এখন হঠাৎ যেন মাথাটার মধ্যে কেমন ঘুরে ওঠে।

তাড়াতাড়ি রাস্তার ধারে একটা লাইট-পোস্ট ধরে নিজেকে যেন সামলাবার চেষ্টা করতে থাকে উমা।

কতক্ষণ লাইট-পোস্টটা ধরে দাঁড়িয়েই থাকে।

তারপর আবার এক সময় ক্লান্ত অবসন্ন পা দুটো টেনে টেনে চলতে শুরু করে।

হিমাদ্রি আবার বিয়ে করেছে। তাহ'লে উমাকে আজ আর তার মনে নেই।

হাঁটছে তো হাঁটছেই উমা।

কোথায় যাবে কিছুই তো জানে না, কোথায় একটু আশ্রয় মিলবে সে রকম কোন ঠিকানাই তো তার জানা নেই।

থামেনি উমা, হেঁটেই চলেছিল; কত রাত হয়ে গিয়েছে-তাও খেয়াল করেনি, ধীরে ধীরে শহর কলকাতার রাস্তায় পথিকের ভিড়, যানবাহনের ভিড়ও যে ক্রমে এসেছে তাও টের পায়নি।

কোনমতে পা ছুটো টেনে টেনে হেঁটেই চলেছিল।

ক্ষুধা তৃষ্ণা সব কিছু যেন তখন ভুলে গিয়েছিল উমা।

ক্রমে শহরের কোলাহল থেমে গিয়েছে, ঘরে ঘরে আলো নিভে গিয়েছে, জ্বলছে তখন শুধু নির্জন রাস্তার হু'ধারে ইলেকট্রিক আলোগুলো।

চওড়া ট্রাম রাস্তা ধরে হাঁটছিল উমা, হঠাৎ যেন পাশ থেকে একটা ধাক্কা লাগল।

মুহূর্তে সব অন্ধকার হয়ে গেল, ছিটকে রাস্তার ধারে পড়ে গেল উমা।

যে গাড়িটার সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল সেই গাড়ির আরোহী তাড়াতাড়ি ততক্ষণে গাড়ি থামিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছেন।

ডাঃ সুধাকান্ত সেন রোগী দেখে ফিরছিলেন।

রাস্তায় পড়েছিল উমা।

পরীক্ষা করে দেখলেন, জ্ঞান হারিয়েছে বটে মেয়েটি কিন্তু দেহের কোথায়ও বিশেষ কোন আঘাত লাগেনি।

পাঁজাকোলা করে তুলে নিলেন সুধাকান্ত ওর জ্ঞানহীন দেহটা নিজের গাড়িতে।

একবার ভাবলেন হাসপাতালেই কোথাও পৌছে দেবেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবার যেন কি ভেবে নিজের বাড়িতেই নিয়ে এলেন।

সুধাকান্ত একা মানুষ, বিয়ে-থা করেননি, চাকর ঠাকুর নিয়ে একাই থাকেন বাড়িতে।

বাড়িতে এনে শয্যার 'পরে শুইয়ে দিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করতে গিয়ে সুধাকান্ত বুঝলেন মেয়েটি অন্তঃসত্বা।

পরের দিন সকালে।

উমার জ্ঞান ফিরে এসেছিল কিন্তু তখন সে অত্যন্ত দুর্বল। চিন্তার ধারাটা তখন মাথার মধ্যে যেন জট পাকিয়ে রয়েছে।

কুয়াশার মতই সব অস্পষ্ট আব্ছা।

নিরালম্ব একটা শূন্যতার মধ্যে তখনো সে যেন ভাসছে।

তোমার নাম কি? কে যেন কোথা থেকে প্রশ্ন করে।

উমা।

মাথায় তোমার সিঁদুর রয়েছে, তোমার স্বামী কোথায়?

জানি না।

ডাঃ সুধাকান্ত সস্নেহে মেয়েটির বিষণ্ণ মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন।

অভিজ্ঞ সুধাকান্তর মেয়েটির সংক্ষিপ্ত জবাবে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, যে কারণেই হোক মেয়েটি দুর্ভাগিনী, নইলে এই অবস্থায় স্বামী বর্তমানেও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত না। তাই সুধাকান্ত বুঝতে পারেন না অতঃপর মেয়েটিকে কোন্ প্রশ্ন করবেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন।

উমাও খোলা জানালাপথে তাকিয়ে আছে।

কাল অত রাত্রে কোথায় যাচ্ছিলে একা একা?

উমা সে প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না, চুপ করে থাকে।

এ শহরে তোমার কি কোন পরিচিত জন নেই উমা?

না তো।

কেউ নেই?

না।

তাহ'লে ?

আমি যাই—বলতে বলতে উমা যাবার জন্যই বুঝি উঠে দাঁড়ায়।

কিন্তু দুর্বলতায় শরীর তার কাঁপতে থাকে।

সুধাকান্ত তাড়াতাড়ি বাধা দেন, উঠো না, উঠো না—শুয়ে থাকো, তোমার বিশ্রামের দরকার, শরীর তোমার এখনো অত্যন্ত দুর্বল।

না, আমি যাই—

কিন্তু এই তো বললে, তোমার এখানে পরিচিত কেউ নেই। তবে যাবে কোথায় ?

কোথায় যাবো ?

হ্যাঁ।

রাস্তায়—

মৃদু হেসে সুধাকান্ত বললেন, রাস্তায় কি কোন আশ্রয় আছে ? বোস—

পথ চলা তো দূরে থাক দাঁড়াবার মত ক্ষমতাও ছিল না তখন বুঝি—তাই সে পুনরায় বসে পড়ে শয্যার উপর।

বুঝতে পারছি উমা ভাগ্যই আজ তোমাকে পথে এনে দাঁড় করিয়েছে। আমার এখানে অবিশ্যি তুমি থাকতে পারতে কিন্তু আমার বাড়িতে কোন মেয়েছেলে নেই। তুমি থাকলে হয়তো নানা জনে নানা কথা বলবে, মিথ্যে তোমাকে আমি সে অপমানের মধ্যে ফেলতে চাই না। তুমি যদি রাজী থাক তো আমার একটা জানাশোনা অবলা-আশ্রম আছে সেখানে তোমার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

অবলা-আশ্রম !

সহসা উমার দু'চোখের দৃষ্টি জলে যেন ঝাপ্‌সা হয়ে যায়। জলভরা চোখে কিছুক্ষণ মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর একসময় ধীরে ধীরে চোখের জল আঁচলে মুছে মৃদুকণ্ঠে বলে, তাই দিন—

তাহ'লে ?

আমি যাই—বলতে বলতে উমা যাবার জন্যই বুঝি উঠে দাঁড়ায়।

কিন্তু দুর্বলতায় শরীর তার কাঁপতে থাকে।

সুধাকান্ত তাড়াতাড়ি বাধা দেন, উঠো না, উঠো না—শুয়ে থাকো, তোমার বিশ্রামের দরকার, শরীর তোমার এখনো অত্যন্ত দুর্বল।

না, আমি যাই—

কিন্তু এই তো বল্লে, তোমার এখানে পরিচিত কেউ নেই। তবে যাবে কোথায় ?

কোথায় যাবো ?

হ্যাঁ।

রাস্তায়—

মৃদু হেসে সুধাকান্ত বললেন, রাস্তায় কি কোন আশ্রয় আছে ? বোস—

পথ চলা তো দূরে থাক দাঁড়াবার মত ক্ষমতাও ছিল না তখন বুঝি—তাই সে পুনরায় বসে পড়ে শয্যার উপর।

বুঝতে পারছি উমা ভাগ্যই আজ তোমাকে পথে এনে দাঁড় করিয়েছে। আমার এখানে অবিশ্যি তুমি থাকতে পারতে কিন্তু আমার বাড়িতে কোন মেয়েছেলে নেই। তুমি থাকলে হয়তো নানা জনে নানা কথা বলবে, মিথ্যে তোমাকে আমি সে অপমানের মধ্যে ফেলতে চাই না। তুমি যদি রাজী থাক তো আমার একটা জানাশোনা অবলা-আশ্রম আছে সেখানে তোমার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

অবলা-আশ্রম !

সহসা উমার দু'চোখের দৃষ্টি জলে যেন ঝাপ্‌সা হয়ে যায়। জলভরা চোখে কিছুক্ষণ মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর একসময় ধীরে ধীরে চোখের জল আঁচলে মুছে মৃদুকণ্ঠে বলে, তাই দিন—

পরের দিনই সুধাকান্ত বেলঘরিয়ায় 'মাতৃমঙ্গল' আশ্রমে উমাকে রেখে এলেন।

উমা কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পারে কেউই তার সমগোত্রীয়া নয় ঐ 'মাতৃমঙ্গল' আশ্রমে।

জীবনের পথে চলতে গিয়ে যে মেয়েদের কখনো ভুলে, কখনো প্রলোভনে পা পিছলেছে, গায়ে কালি মেখে তারাই এসে আশ্রয় নিয়েছে এই মাতৃমঙ্গল আশ্রমে।

দু'দিনেই যেন হাঁপিয়ে ওঠে উমা।

জীবনের বিচিত্র নিষ্ঠুর আর এক রূপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনের উপরে, মানুষের উপরে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপরেও যেন তিল তিল করে একটা ঘৃণা বুকটার মধ্যে তার জমে উঠতে থাকে।

কিন্তু উপায় কি।

গর্ভে আজ তার সন্তান।

ঐ সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত তার এই আশ্রমে থাকতেই হবে।

তার পর না হয় সে তার নিজের পথ খুঁজে নেবে।

ছেলেকে বুকে নিয়ে সে না হয় আবার পথে গিয়ে দাঁড়াবে।

ভিক্ষে করে দিন চালাবে তবু তো এই নিরন্তর অসম্মানের হাত থেকে মুক্তি মিলবে।

আশ্রমে নানা জনে নানা ধরনের প্রশ্ন করে উমাকে। কার ছেলে, ছেলের বাপ কোথায়?

কেন ছেলের বাপ তাকে ত্যাগ করলো?

মাঝে মাঝে আবার নানা বক্রোক্তিও কানে আসে, কিসের স্বামী! স্বামী আছে না ছাই আছে! মাথার সিঁদুর ভেক্। ফুর্তির শখ মিটে গিয়েছে, লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।

সব শোনে উমা কিন্তু মুখ বুজে থাকে।

রাত্রে নিঃসঙ্গ শয্যায় শুয়ে একা একা চোখের জলে বুক ভেজায়।

প্রতিবাদ জানাবে, সে পথও যে হিমাদ্রি আজ আর তার রাখেনি।

সব থেকেও যে তার কিছু নেই।

সম্মানের দাবি নিয়েও যে আজ সে অসম্মানের ধূলায় লুণ্ঠিত।

তবু কিন্তু উমা ভগবানের কাছে মাথা খোঁড়ে না।

কোন দয়া ভিক্ষা করে না।

শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট দিনে উমার একটি ছেলে হলো।

চাঁদের মতই ফুটফুটে ছেলে।

ছেলের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে নতুন করেই যেন আবার চোখে জল নেমে আসে উমার।

ভাবে এই চাঁদের মত ছেলে—একে সে দুঃখিনী মা কেমন করে মানুষ করে তুলবে!

হিমাদ্রির আত্মজ কিনা আজ দুঃখী অনাথ আতুর ও নাম-গোত্র-পরিচয়-হীনদের দলে ধুলোকাদা মেখে অবহেলা ঘৃণা ও অবজ্ঞা কুড়িয়ে কুড়িয়ে এই মাতৃমঙ্গল আশ্রমের পঙ্কের মধ্যে বড় হবে!

কেন! কোন্ পাপে, কোন্ বিচারে?

সে দুর্ভাগিনী বলেই কি তার দুঃখের বোঝা তার সন্তানকেও চিরজীবন বহন করে যেতে হবে।

পরিচয় পাবে না, কোন স্বীকৃতি পাবে না তার সন্তান!

বাপের নামটা পর্যন্ত উচ্চারণ করবার কোন অধিকার থাকবে না!

যত ভাবে ততই যেন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে উমার সমস্ত মন। এ অন্যায়, এ অত্যাচারকে সে সহ্য করলেও তার সন্তান কিছুতেই সহ্য করবে না।

কিন্তু সহ্য যে করবে না, প্রতিকারের পথই বা কোথায়? কোনো পথই তো উমা খুঁজে পায় না।

কি করবে উমা?

কি করবে ?

ছেলে ক্রমে এক মাসের হলো, ছ'মাসের হলো। উমা ভাবে আর ভাবে।

কোন পথই খুঁজে পায় না।

জন্ম রেজিস্ট্রিতে উমা সন্তানের পিতৃ-পরিচয় দিতে পারেনি।

একবার ভেবেছিল উমা যে হিমাদ্রির পরিচয়ই সে দিয়ে দেয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি জানি কি ভেবে দিতে পারে না।

গলা দিয়ে কিছুতেই হিমাদ্রির নামটা বের করতে পারেনি।

আটকে গিয়েছে গলার মধ্যে।

কিন্তু উমা যে ভেবেছিল ছেলে ভূমিষ্ঠ হলে আর একটা দিনও সে আশ্রমে থাকবে না, ছেলেকে বুকে করে নিয়ে যেদিকে দুই চোখ যায় পথে বের হয়ে পড়বে, ভিক্ষা করে পথে পথে মা ও ছেলের জীবন চালাবে, শেষ পর্যন্ত তাই বা সে পারল কোথায় ?

অনিশ্চয়তার মধ্যে পা দিতে সে পারেনি।

ভয়ে বুক কেঁপে উঠেছে।

বাড়ির বাইরে পা দেবার পর থেকে এই কয়মাসের অভিজ্ঞাই তার পথ রোধ করেছে।

কিন্তু এইভাবে অজ্ঞাত অখ্যাত হয়ে তার ছেলেকে সে মানুষ হতে দিতে পারে না।

একটা ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে।

ভাবে কিন্তু কোনই যেন কূল-কিনারা পায় না।

কখনো নিজের অসহায় অবস্থা, কখনো হতাশা, কখনো আক্রোশ, কখনো অভিমান উমাকে যেন পীড়ন করতে থাকে।

অবশেষে ভাবতে ভাবতেই বুঝি একটা কথা তার সহসা মনে হয়।

হিমাদ্রির ছেলেকে হিমাদ্রির দোরগোড়াতেই সে নামিয়ে দিয়ে চলে আসুক না কেন।

হ্যাঁ তাই সে করবে, হিমাদ্রি তার ছেলের দায়িত্ব নিতে হয় নিক সে আর এ দায়িত্ব বহন করবে না।

কয়টা দিন কথাটা ভাবলো উমা।

নিশ্চয়তা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দোল খেল।

সংশয়ে পীড়িত হলো।

তারপর মন স্থির করলো।

তাই সে করবে।

॥ দশ ॥

যতিশঙ্করের গৃহে ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে!

হিমাদ্রির এখনো বিলেত থেকে ফেরার সময় হয়নি।

যতিশঙ্কর অকস্মাৎ মাস দুই পূর্বে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়েছেন।

হিমাদ্রির স্ত্রী অমিতা একা বাড়িতে থাকে। যতিশঙ্করের দাস-দাসী দারোয়ান ড্রাইভার ছাড়াও, ছোটবেলায় অমিতাকে যে সরলা দাসী মানুষ করেছিল, তাকে বাপের বাড়ি থেকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছে সে।

সেই সরলাই সর্বক্ষণ দেখা-শোনা করতো অমিতার।

আর ছিল যতিশঙ্করের আশ্রিত—তাঁরই দূর সম্পর্কের বোনের ছেলে নবাগত অচিন্ত্য।

অচিন্ত্য প্রায় হিমাদ্রিরই সমবয়সী হবে।

সংসারে তিনকুলে কেউ নেই, আশ্রয়হীন দূর সম্পর্কের ভাগ্নে অচিন্ত্যকে একদা দয়াপরবশ হয়েই গৃহে স্থান দিয়েছিলেন মৃত্যুর বছর খানেক আগে যতিশঙ্কর।

পথে পথে ভেসে বেড়াচ্ছিল অচিন্ত্য।

লেখাপড়া শেখেনি কিন্তু লেখাপড়া না শিখলেও ক্রূর বুদ্ধি ছিল যথেষ্ট, এবং সেই বুদ্ধির জোরে মামার আশ্রয় একবার পেয়ে আশ্রয়টা পাকাপোক্ত করে নিতে দেরি হয়নি অচিন্ত্যর।

যাই হোক হিমাদ্রির অনুপস্থিতিতে এবং যতিশঙ্করের আকস্মিক মৃত্যুতে অচিন্ত্যই অমিতার গৃহে পুরুষ অভিভাবক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অচিন্ত্যর চরিত্রে বিশেষ একটা গুণ ছিল, মানুষের মনোরঞ্জন করে তার বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠতে পারত খুব শীঘ্র সে। এবং সেই বিশেষ গুণেই অমিতাকে সে খুব সহজেই, যাকে বলে হাতের মুঠোর মধ্যে আনতে সক্ষম হয়েছিল।

অমিতার একা একা যেন সময় কাটতে চায় না।

বই পড়ে, বেড়িয়ে, সেলাই করে, গান-বাজনা করেও সময় যেন অনেক থেকে যায় হাতে।

হিমাদ্রি যে কবে বিলেত থেকে ফিরবে!

ছুটে ছুটে বাবার কাছে যায়! মা তো আগেই মারা গেছেন।

কখনো কখনো খুব ভোরে গাড়ি নিয়ে চলে যায় নিজেই ড্রাইভ করে বাবার ওখানে। সারাদিন সেখানে থেকে হয়ত বিকেলে ফিরে আসে।

সেদিনও খুব ভোরে উঠে বাবার ওখানে যাবে বলে সেজেগুজে বের হয়ে সিঁড়ি দিয়ে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে নামছে, হঠাৎ সিঁড়ির মাঝামাঝি একটা শিশুর কান্না শুনে থমকে দাঁড়ালো।

ছোট শিশুর কান্না এ বাড়িতে কোথা থেকে আসছে!

একটু বিস্মিত হয়েই শেষ সিঁড়ির ধাপে নেমে আসতেই দরজার গোড়ায় অচিন্ত্যর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল।

অচিন্ত্যর বুকের কাছে ধরা কাপড়ে-জড়ানো একটি ছোট্ট শিশু, সেই শিশুটিই কাঁদছে।

বিস্মিত হয়ে অমিতা শুধোয়, কি ব্যাপার, অচিন্ত্য?

অমিতা অচিন্ত্যকে প্রথম প্রথম ঠাকুরপো বলেই ডাকতো।

কিন্তু অচিন্ত্য বলেছিল, ও সেকেলে ডাকটা আদৌ আমার ভাল

লাগে না বৌদি।

কেন বল তো ?—মৃদু হেসে শুধিয়েছিল অমিতা।

তা জানি না। তবে তুমি আমাকে অচিন্ত্য বলেই ডেকো।

বেশ। তোমার যখন ইচ্ছা তখন তাই হবে।

সেই থেকে অমিতা অচিন্ত্যকে নাম ধরেই ডাকত।

একটা বাচ্চা—

বাচ্চা! কোথা থেকে এলো ?

তা তো জানি না, ভোরবেলা গেটের সামনে কান্না শুনে এগিয়ে গিয়ে দেখি কাপড়ে জড়ানো এই বাচ্চাটা পড়ে আছে আর তার সঙ্গে একটা চিঠি আর এই আংটিটা—

চিঠি! আংটি!

হ্যাঁ, দেখ না!

'কই দেখি' বলে অচিন্ত্যর হাত থেকে বিশেষ কৌতূহলে হাত বাড়িয়ে প্রথমে আংটিটা নিল, আর নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আংটির 'পরে মীনাকরা ইংরেজী অক্ষর 'H' নজরে পড়লো। তারপর অচিন্ত্যর বুকের মাঝখানে কাপড়ে জড়ানো শিশুটির দিকে চেয়ে দেখলো অমিতা।

টুকটুকে ফুলের মত একটি শিশু।

নিজের অজ্ঞাতেই শিশুটির মুখের দিকে চেয়ে থাকে অমিতা।

আহা রে, কার বাছা—কে জানে! কোন্ নিষ্ঠুর মা ওকে অমন করে ফেলে গেলো!

শিশুটি তখন কান্না থামিয়ে হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা মুখের মধ্যে পুরে চুক চুক করে চুষছে।

চোখে কাজল টানা।

কপালে কাজলের টিপ, পরিচ্ছন্ন একটি জামা গায়ে, পথের শিশু নয়।

চিঠিটা কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়েই অচিন্ত্যর হাত থেকে নিয়ে ভাঁজটা খুললো এবারে অমিতা।

কিন্তু চিঠির প্রথম শব্দ সম্বোধনের প্রতি নজর পড়তেই যেন সহসা ভূত দেখার মতই চমকে ওঠে অমিতা।

হিমাদ্রি।

হিমাদ্রি বলে সম্বোধন করে কে চিঠি লিখলো! কিন্তু কই সংক্ষিপ্ত চিঠির নিচে তো কারো নাম নেই।

হাত দুটো কাঁপছে তখন অমিতার।

বুকের নিঃশ্বাসও যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

তবু চিঠিটা পড়ে অমিতা।

হিমাদ্রি,

ক্ষমা করো। একান্ত অনন্যোপায় হয়েই, তুমি আমাকে ত্যাগ করা সত্ত্বেও, তোমার সন্তান—তোমার ছেলেকে তোমার দোরগোড়ায় নামিয়ে রেখে গেলাম। রাজা তুমি, তোমার সন্তানকে মানুষ করে তোলবার মত দুঃখিনী আমার সাধ্য নেই বলেই এ কাজ আমাকে করতে হলো। তোমাকে যখন কথা দিয়েছি, নিশ্চিন্ত থেকো, তোমার ছেলের পরিচয় কাউকে আজ পর্যন্ত আমি দিইনি আর আজ চিরবিদায় নেবার পথে পা বাড়িয়েও দিলাম না। তোমার দরজায় নামিয়ে দিয়ে গেলাম, ইচ্ছা হয় তোমার এ সন্তানকে তুমি গ্রহণ ক'রো, না হয় ডাস্টবিনে ফেলে দিও বা গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিও।

চিঠিটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অকস্মাৎ অমিতার মাথাটা যেন কেমন ঘুরে ওঠে।

সমস্ত পরিদৃশ্যমান জগৎটা যেন মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে যায়।

তারপর কোন কিছুই আর অমিতার মনে থাকে না।

কেবল জ্ঞান হারাবার পূর্ব মুহূর্তে চীৎকারটা তার বুঝি কানে এসেছিল।

জ্ঞান ফিরলো প্রায় আধঘণ্টা পরে। সরলা মাথার কাছে বসে, তার বাবা পাশে আর ডাক্তার রুদ্র বাবার পাশে।

চোখ মেলে তাকাতেই অমিতার বাবা সিদ্ধার্থ রায় ডাকলেন, মা!

সেই ছেলেটি, ছেলেটি কোথায় বাবা ?

সরলাই জবাব দিল, নিচের ঘরে রয়েছে, হাসপাতালে খবর দেওয়া হয়েছে তারা এখুনি এসে নিয়ে—

সরলার কথা শেষ হলো না, অমিতা চীৎকার করে উঠলো, না, না—ওকে হাসপাতালে দিও না। ও এখানেই থাকবে, এখানেই থাকবে।

অমিতার বাবা সিদ্ধার্থ রায় বলেন, সে কি! কি বলছো মা তুমি, না—না, কার না কার ছেলে, জন্মের ঠিক আছে কি নেই— দোরগোড়ায় ফেলে গেছে—

না, না—তবু—তবু ওকে আমি হাসপাতালে দেবো না। বলতে বলতে উঠে বসবার চেষ্টা করে অমিতা।

ডাক্তার রুদ্র তাড়াতাড়ি বলেন, বেশ তো মা তাই হবে, তুমি উত্তেজিত হয়ো না। তাই হবে—

সরলা!

দিদিমণি!

তাকে নিয়ে আয় এই ঘরে, এখনি নিয়ে আয়।

অমিতার বাবা প্রতিবাদ জানাতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু চোখের ইশারায় ডাঃ রুদ্র নিষেধ করলেন।

সরলাকে বললেন, যাও সরলা নিয়ে এসো।

সরলারও ইচ্ছা ছিল না তেমন, কিন্তু ডাক্তারের কথায় আর সে প্রতিবাদ জানালো না।

ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ঐ সময় অমিতার আবার চিঠিটার কথা মনে পড়ে গেলো।

অমিতা এদিক-ওদিক তাকিয়ে শুধায়, অচিন্ত্য, অচিন্ত্যকে দেখছি না যে, সে কোথায়!

সিদ্ধার্থ রায় বলেন, সে তো নিচে, ডাকবো তাকে ?

ডাকো।

সত্যিই অচিন্ত্য নিচের ঘরেই ছিল।

একটা আরাম-চেয়ারে গা ঢেলে একটা সিগারেট টানতে টানতে অনেক কথাই ভাবছিল সে।

সরলা এসে তার ঘরে ঢুকলো, তোমাকে একবার দিদিমণি ডাকছে গো দাদাবাবু।

কেমন আছে এখন বৌদি?

ভাল।

চল।

অচিন্ত্য উঠে দাঁড়াল।

একটু পরেই সরলার সঙ্গে সঙ্গে অচিন্ত্য এসে অমিতার ঘরে ঢুকল।

বৌদি—কেমন আছ এখন?

অচিন্ত্য, এসো—

অচিন্ত্য অমিতার শয্যার পাশে এসে দাঁড়ায়।

অমিতা এবার তার বাবা ও ডাঃ রুদ্রর মুখের দিকে তাকাল।

তারপর মৃদু কণ্ঠে ডাকল, বাবা।

কি মা!

তুমি আর ডাঃ রুদ্র একটু যদি ওঘরে যাও। অচিন্ত্যকে আমি একটা কথা বলতে চাই।

তাঁরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত ডাঃ রুদ্রর চোখের ইশারাতেই দু'জনে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

অচিন্ত্য!

বল বৌদি।

নিম্নকণ্ঠে অমিতা শুধালো, সেই চিঠিটা, চিঠিটা কোথায় অচিন্ত্য?

আমার কাছেই আছে, কাউকে আমি দিইনি।

কই চিঠিটা! দেখি।

অচিন্ত্য তার জামার ভিতর থেকে চিঠি আর আংটিটা বের করে অমিতার হাতে দিল।

কেউ দেখেনি তো এ চিঠি?

হাত পেতে চিঠি আর আংটিটা নিল অমিতা।

না। আমি আমার কাছেই রেখে দিয়েছিলাম।

এ চিঠির কথা তুমি কাউকে বলো না অচিন্ত্য।

না। তুমি যখন বলছো, বলবো না।

হ্যাঁ বলো না। আচ্ছা তুমি যাও—

অচিন্ত্য ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সরলা ঘুমন্ত শিশুটিকে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো।

ও আজ থেকে আমার এই ঘরে থাকবে সরলা, তুই সব ব্যবস্থা করে দে—অমিতা বলে।

দিদিমণি—

যা বলছি শোন্। যা—

একটু পরে যখন হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্স এল, ডাঃ রুদ্রই তাদের ফিরিয়ে দিলেন।

মিথ্যা কথা বললেন, একটা ভুল খবর নাকি তাদের দেওয়া হয়েছিল।

একটু পরে মেয়েকে সুস্থ দেখে অমিতার বাবাও সেদিনের মত ফিরে গেলেন।

পরের দিন এসে আবার মেয়েকে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন; কিন্তু অমিতার সেই এক কথা, ওকে সে নিজের কাছেই রাখবে, কোথাও দেবে না।

সরলাও অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু অমিতা স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

বিরক্ত হয়েই অমিতার বাবা বিলেতে জামাইকে চিঠি দিয়ে সব কথা জানালেন।

দিন দশেক বাদে অমিতার কাছে হিমাদ্রির চিঠি এল।

তোমার বাবার চিঠিতে যা পড়লাম তার তো মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারছি না অমু। কার না কার ছেলে, কে না কে,

জাত-জন্মের ঠিক নেই—হয়ত কেউ তার গোপন পাপের ফল আমাদের গেটের সামনে ফেলে রেখে গিয়েছিল—সেই ছেলেকে নাকি তুমি আমাদের ঘরে নিয়েছো—সকলে বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও ? হঠাৎ এ আবার কি খেয়াল হলো তোমার, বুঝতে পারছি না তো ?

অমিতা হিমাদ্রির চিঠির জবাব দিল, কিন্তু সেই ছেলে সম্পর্কে কোন কথাই লিখলো না।

হিমাদ্রি আবারও যখন সেই ছেলের সম্পর্কে নানা কথা লিখলো অমিতা তার জবাবে লিখলো, লোকে যাই বলুক আমি জানি সে ছেলে নাম-গোত্র-পরিচয়হীন নয়। এবং তার সেই পরিচয়ের জোরেই আমাদের ঘরে সে স্থান পেয়েছে জেনো।

॥ এগারো ॥

সরলারও আপত্তির আর অন্ত নেই।

সত্যিই অমিতা যেন ছেলেটাকে নিয়ে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছে।

দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টাই বলতে গেলে যেন ঐ ছেলে নিয়ে ব্যস্ত অমিতা।

তাকে নিজ হাতে স্নান করাচ্ছে, সাজাচ্ছে, খাওয়াচ্ছে। প্রত্যহ মার্কেট থেকে তার নতুন নতুন জামা খেলনা কত কি যে আসছে।

চব্বিশ ঘণ্টাই যেন ছেলে, ছেলে আর ছেলে।

একদণ্ড চোখের আড়াল করবে না, ছেলের ব্যাপারে আর কাউকে বিশ্বাস করবে না।

বাড়ির সবাই যেন তার ঐ ছেলের শত্রু।

সরলা তো রীতিমত রাগারাগিই করে।

তোমার কি ব্যাপার বল তো দিদিমণি ?

ছেলেকে দোলনায় শুইয়ে দোল দিতে দিতে সরলার দিকে না তাকিয়েই অমিতা শুধোয়, কেন কি হলো আবার ?

কি হলো মানে ? এসব কি বাড়াবাড়ি আদিখ্যেতা শুরু করেছো ?

জবাব দেয় না অমিতা সরলার কথার, ছেলের দোলনায় দোল দিতে থাকে।

কোথাকার কে এক অজাত কুজাতের ছেলে, বাপ-মায়েরও হয়ত ঠিক নেই—

সরলা ! তীক্ষ্ণকণ্ঠে সহসা চিৎকার করে ওঠে অমিতা।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—কার না কার পাপ হয়ত, রাতারাতি দোরগোড়ায় ঘাড় থেকে নামিয়ে রেখে গিয়েছে।

যা জানিস না তা নিয়ে কথা বলিস না।

বলবো না মানে, একশবার বলবো, যত সব অমঙ্গুলে অনাছিষ্টি কাণ্ড ! ছিঃ ছিঃ—

তুই এখান থেকে যাবি সরলা !

ভেবেছো কি তুমি ! রাতারাতি একদিন আমি গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসব।

কি বললি ?

যা বললাম তাই করবো জেনো।

কথাটা বলে সরলা চলে যাচ্ছিল। অমিতা তাকে থামালো।

সরলা কালই তুই বাবার ওখানে চলে যাবি, তোকে আর আমার দরকার নেই। কথাটা বলে ছেলেকে বুকে তুলে নিয়ে অমিতা ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

সত্যি সত্যিই পরদিন সরলাকে চলে যেতে হয়।

সরলা গিয়ে অমিতার বাবার সামনে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেলে।

কি হলো, কাঁদছিস কেন ? অমিতার বাবা শুধান।

তোমার মেয়ে আমাকে তাড়িয়ে দিল কত্তাবাবু !

সে কি রে!

হ্যাঁ, ঐ অজাত কুজাত ছেলেটার কথা বলতে গিয়েছিলাম তাই তাড়িয়ে দিল আমায়।

সত্যিই খুকীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে সরলা। তুই কাঁদিস না—

সরলার পরিণাম দেখে অন্যান্য দাসদাসীরা ভয়ে আর উচ্চবাচ্য করে না।

সরলাকে বাড়ি থেকে বিদায় করে দেবার পর আর একজনের কথাও সেই সঙ্গে অমিতার মনে পড়ে।

অচিন্ত্য।

কয়েক দিন থেকেই যেন লক্ষ্য করছিল অমিতা অচিন্ত্যর চোখে কেমন একটা দৃষ্টি।

একমাত্র অচিন্ত্যই ঐ কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেটি সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোন রকম মন্তব্য করেনি, সপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথাই বলেনি সত্যি—কিন্তু তবু তার চোখের দৃষ্টিটা ইদানীং যেন কেমন কেমন মনে হয় অমিতার।

চিঠিটা আর আংটিটা অবিশ্যি অচিন্ত্য তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল চাওয়া মাত্রই, তবু যেন তার ঐ নিঃশব্দ আচরণ অমিতার আদৌ ভাল লাগছে না।

কয়েকটা দিন কেবল অচিন্ত্যর কথাই ভাবে অমিতা কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না।

ঘরের মধ্যে চুপচাপ সে-রাত্রে অন্ধকার জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল অচিন্ত্য।

গত কয়দিন থেকেই একটা চিন্তা তার মাথার মধ্যে দিবারাত্র যেন মাকড়সার মত জাল বুনে চলেছে।

হিমাদ্রিকে সম্বোধন করে আংটির সঙ্গে যে চিঠিটা গেটের সামনে কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলেটির বুকের উপরে ছিল, সেই চিঠিটার

কথাই কদিন ধরে ভাবছে অচিন্ত্য।

অমিতা এখনো জানতে পারেনি অবিশ্যি যে আসল চিঠিটা নকল করে নকল চিঠিটাই অচিন্ত্য অমিতাকে দিয়েছিল সেদিন।

আসল চিঠিটা এখনো তারই কাছে রয়েছে।

তার বাক্সের মধ্যে।

পত্রের নিচে যদিও কারো নাম স্বাক্ষর নেই তবু অচিন্ত্যর বুঝতে কষ্ট হয়নি যে, কোন একটি মেয়েরই লেখা চিঠিখানা।

চিঠিটা পড়ে এ-ও বুঝতে পেরেছে অচিন্ত্য—মেয়েটি যে-ই হোক, একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তার একদিন নিশ্চয়ই গড়ে উঠেছিল হিমাদ্রির সঙ্গে, যার ফল ঐ সন্তান।

পরিত্যক্ত ঐ ছেলেটি যেন হিমাদ্রিরই সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই অচিন্ত্যর। চিঠিটা পড়ে আরো একটা ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত অচিন্ত্য—সেই মেয়েটি তার সন্তানকে হিমাদ্রির গেটের সামনে রেখে চলে গিয়ে আত্মত্যাগ করেছে।

সেই আশাতেই প্রত্যহ কদিন ধরে অচিন্ত্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সংবাদপত্রে আত্মহত্যার যাবতীয় সংবাদগুলো পড়ছিল, কিন্তু নির্ভরযোগ্য কোন সিদ্ধান্তে এখনও পৌছতে পারেনি।

মীনা-করা আংটিটা দেখে অমিতা চিনতে পারেনি। কারণ পূর্বে হিমাদ্রির সঙ্গে আলাপের সুযোগ ও তাকে দেখবার সুযোগ খুব সামান্যই হয়েছিল।

কিন্তু চিঠিটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন মন তার নিজের অজ্ঞাতেই বলে উঠেছিল, কোন অমোঘ নিষ্ঠুর সত্য ঐ চিঠিটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ঐ চিঠিটা মিথ্যা নয়, কঠোর সত্য।

এবং সেইটাই মনের মধ্যে তার নিদারুণ আঘাত হেনেছিল। কারণ ঐ মুহূর্তে, ঐ চিঠিটার সঙ্গে সঙ্গে, আরো দুটি ব্যাপার তার মনের পাতায় ভেসে উঠেছিল।

ওদের হনিমুনের পর গোপালপুর-অন-সি থেকে ফিরে এসে দাদুর

যে চিঠিটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হিমাদ্রি বিশেষভাবে বিচলিত হয়ে উঠেছিল এবং যে চিঠিটা সেদিন—আজ মনে হয় অমিতার—হিমাদ্রি তাকে ইচ্ছা করেই দেখায়নি, সে চিঠিটা মাত্র কিছুদিন আগে লাইব্রেরীতে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ সে পেয়ে গিয়েছিল একটি বইয়ের মধ্যে। দ্বিতীয়—বিলাত যাত্রার কয়েকদিন পূর্বে একদিন গেটের ধারে দেখা সেই মেয়েটি এবং তাকে দেখে হিমাদ্রির সহসা বিচলিত হয়ে ওঠার ব্যাপারটা।

ঐ দুটি চিঠি, পরিত্যক্ত ছেলেটি ও সেই মেয়েটি, সব কিছু মিলিয়েই অমিতার মনের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল—ঐ চিঠি ও পরিত্যক্ত সন্তান মিথ্যা নয়।

সব সত্য।

নিষ্ঠুর সত্য।

সেই সঙ্গে সঙ্গেই হিমাদ্রির প্রতি নিদারুণ একটা অভিমানে অমিতার সমস্ত বুকখানা যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল।

সমস্ত অন্তর দিয়েই হিমাদ্রিকে ভালবেসেছিল অমিতা, সেই ভালবাসার এই প্রতিদান পেল কিনা সে!

তার বুকভরা ভালবাসাকে এমনি করে লাঞ্ছিত করলো হিমাদ্রি!

আর কাউকেই যদি ভালবেসেছিল হিমাদ্রি তো মুখ ফুটে সে কথা বললো না কেন তাকে?

সে হাসিমুখে হিমাদ্রির জীবন থেকে সরে দাঁড়াতো।

এ কি করলো হিমাদ্রি, তার এবং আর একটি সম্পূর্ণ নিরপরাধিনী মেয়ের জীবন এমনি করে ব্যর্থ করে দিল!

মেয়েটির চিঠি পড়ে স্পষ্ট বোঝা যায় হতভাগিনী তার সন্তানটিকে হিমাদ্রির দোরগোড়ায় নামিয়ে রেখে গিয়ে আত্মহত্যাই করেছে।

আজ সেই হতভাগিনীর মৃত্যুর জন্য একমাত্র হিমাদ্রিই তো দায়ী নয়, সেও যে দায়ী!

তার জন্যই হয়ত শেষ পর্যন্ত হিমাদ্রি সমস্ত ব্যাপারটা গোপন করে গিয়েছে।

যে চিঠিটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হিমাদ্রি বিশেষভাবে বিচলিত হয়ে উঠেছিল এবং যে চিঠিটা সেদিন—আজ মনে হয় অমিতার—হিমাদ্রি তাকে ইচ্ছা করেই দেখায়নি, সে চিঠিটা মাত্র কিছুদিন আগে লাইব্রেরীতে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ সে পেয়ে গিয়েছিল একটি বইয়ের মধ্যে। দ্বিতীয়—বিলাত যাত্রার কয়েকদিন পুর্বে একদিন গেটের ধারে দেখা সেই মেয়েটি এবং তাকে দেখে হিমাদ্রির সহসা বিচলিত হয়ে ওঠার ব্যাপারটা।

ঐ দুটি চিঠি, পরিত্যক্ত ছেলেটি ও সেই মেয়েটি, সব কিছু মিলিয়েই অমিতার মনের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল—ঐ চিঠি ও পরিত্যক্ত সন্তান মিথ্যা নয়।

সব সত্য।

নিষ্ঠুর সত্য।

সেই সঙ্গে সঙ্গেই হিমাদ্রির প্রতি নিদারুণ একটা অভিমানে অমিতার সমস্ত বুকখানা যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল।

সমস্ত অন্তর দিয়েই হিমাদ্রিকে ভালবেসেছিল অমিতা, সেই ভালবাসার এই প্রতিদান পেল কিনা সে!

তার বুকভরা ভালবাসাকে এমনি করে লাঞ্ছিত করলো হিমাদ্রি!

আর কাউকেই যদি ভালবেসেছিল হিমাদ্রি তো মুখ ফুটে সে কথা বললো না কেন তাকে?

সে হাসিমুখে হিমাদ্রির জীবন থেকে সরে দাঁড়াতো।

এ কি করলো হিমাদ্রি, তার এবং আর একটি সম্পূর্ণ নিরপরাধিনী মেয়ের জীবন এমনি করে ব্যর্থ করে দিল!

মেয়েটির চিঠি পড়ে স্পষ্ট বোঝা যায় হতভাগিনী তার সন্তানটিকে হিমাদ্রির দোরগোড়ায় নামিয়ে রেখে গিয়ে আত্মহত্যাই করেছে।

আজ সেই হতভাগিনীর মৃত্যুর জন্য একমাত্র হিমাদ্রিই তো দায়ী নয়, সেও যে দায়ী!

তার জন্যই হয়ত শেষ পর্যন্ত হিমাদ্রি সমস্ত ব্যাপারটা গোপন করে গিয়েছে।

ঠিক আছে, হিমাদ্রির পাপের প্রায়শ্চিত্ত সে-ই করবে।

সেই হতভাগিনীর সন্তানের মা সে-ই হবে।

যে মুহূর্তে অমিতা ব্যাপারটা সত্য বলে মেনে নিয়েছিল সেই পরিত্যক্ত অভাগা ছেলেটির প্রতি তার মন অননুভূতপূর্ব এক মমতায় সেই মুহূর্তেই যেন সিক্ত হয়ে উঠেছিল।

আহা রে! অবোধ শিশু।

নিয়তির কোন্ বিচিত্র বিধানে সব কিছু থেকেও সে আজ এমনি ভাবে বঞ্চিত হলো!

কিন্তু সব কিছু থেকে বঞ্চিত করেও ঘটনাচক্রে ভগবান যখন ওকে তারই দোরগোড়ায় এনে ফেলেছেন তখন সে-ই তাকে বুকে তুলে নেবে।

হয়ত বা বিধাতারই তাই ইচ্ছা ছিল, নচেৎ এমনটাই বা ঘটলো কেন?

ঠিক আছে, বিধাতা যখন ওকে তারই দোরগোড়ায় এনে ফেললেন, তখন ওর মা হবে অমিতাই।

সে-ই ঐ সন্তানকে দেবে জন্মপরিচয়।

ছেলের নাম রাখে অমিতা—প্রদীপ।

॥ বারো ॥

রাত্রিশেষের অন্ধকার তখনো আব্ছা তরল একটা কুয়াশার মতই যেন পৃথিবীর বুকে জড়িয়ে আছে।

ছেলের মুখ মুছিয়ে, কাজল পরিয়ে, টিপ দিয়ে, একটা ভাল জামা পরিয়ে, একটা মোটা কাঁথায় জড়িয়ে নিয়ে মধ্যরাত্রে বের হয়ে এসেছিল উমা আশ্রম থেকে।

রাত্রিশেষের অন্ধকারে হিমাদ্রির বাড়ির গেটের সামনে এসে পৌঁছেছিল।

এবং ঘুমন্ত ছেলেকে ভাল করে কাঁথায় মুড়ে গেটের সামনে শুইয়ে দিয়ে কপালে শেষ বিদায় চুম্বন দিয়ে সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল কিছু দূরে একটা লাইটপোস্টের আড়ালে।

অচিন্ত্য এসে ছেলেটিকে তুলে নিতে উমা আর দাঁড়ায়নি।

হাঁটতে শুরু করেছিল নির্জন রাস্তা ধরে।

কিন্তু কোথায় এবারে যাবে উমা ?

সহসা মনে পড়ে, কেন গঙ্গা !

সর্বপাপহারিণী, সর্বদুঃখনাশিনী গঙ্গার শীতল অতল আশ্রয়ই তো আছে।

নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

যেখানে কোন প্রশ্ন উঠবে না, কারো ঘৃণার দৃষ্টি সহ্য করতে হবে না,—পরম আশ্বাসের, পরম নিশ্চয়তার, পরম শান্তির আশ্রয় !

উমার আর কোন দ্বিধা থাকে না।

হন হন করে হাঁটতে থাকে গঙ্গার দিকেই উমা পর-মুহূর্তে।

গঙ্গার ঘাটে পৌঁছে মনে মনে স্বামীকে একবার প্রণাম জানিয়ে দৃঢ় পদে জলে নেমে যায় উমা।

কোন দিকেই তাকায় না।

কেবল শেষবারের মত মনে মনে বুঝি একবার বলেছিল, মা গঙ্গা আমার স্বামীর মঙ্গল করো, আমার খোকনের মঙ্গল করো।

শীতল স্পর্শ লাগে দেহে, জুড়িয়ে যায় যেন সারা দেহ।

আঃ শান্তি, শান্তি···

মা !

কল কল ছল ছল শব্দ, কানে বুঝি যায় না সে ডাক।

আর একটু নেমে যায় উমা।

মা !

কে !

পশ্চাতে ফিরে তাকায় উমা।

সৌম্যকান্তি গৌরবর্ণ এক প্রৌঢ় কখন ইতিমধ্যে তার পশ্চাতে

এসে দাঁড়িয়েছেন তা টেরও পায়নি উমা।

সৌম্য শান্তি সেই প্রৌঢ়ের মুখে প্রশান্ত সুন্দর হাসি।

প্রৌঢ় ততক্ষণে একখানি গৌরবর্ণ দৃঢ় বলিষ্ঠ হাত উমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। মৃদু শান্ত কণ্ঠে বললেন, হাত ধর মা।

উমা বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

ধর! প্রৌঢ় আবার বললেন।

উমা যেন পাথর।

কি মা, সাহস হচ্ছে না? এ হাত দেখে কি তোমার মনে হচ্ছে না মা, এ তুমি ধরতে পারো, নির্ভর করতে পারো এ হাতের ’পরে। ধর—

মন্ত্রমুগ্ধের মতই যেন এবারে উমা তার কম্পিত হাতটি বাড়িয়ে প্রৌঢ়ের হাতটা ধরে।

এসো।

উমা কিন্তু নিশ্চল।

আত্মহত্যা করতে চলেছিলে মা!

মধুর কণ্ঠে ব্রাহ্মণ আবার প্রশ্ন করলেন।

এমন মধুর কণ্ঠের ‘মা’ ডাক জীবনে কখনো বুঝি শোনেনি উমা।

উমার কণ্ঠে কোন জবাব যোগায় না।

জলের মধ্যে সে নিশ্চল পাষাণের মত তবু দাঁড়িয়ে থাকে।

বুঝতে পেরেছি মা, দুঃখ পেয়েছ তাই নিজেকে বিসর্জন দিতে এসেছ। তোমার সিঁথিতে এয়োতির চিহ্ন দেখছি। কিন্তু মা আত্মহত্যা তো শুধু পাপই নয়—মহাপাপ, স্বামী ও সন্তানের অমঙ্গল হবে যে মা!

সহসা যেন শিউরে ওঠে নিজের অজ্ঞাতেই উমা।

এসো মা, উঠে এসো। পরম স্নেহভরে আবার ডাকলেন ব্রাহ্মণ, এসো—

কি আকর্ষণ ছিল সে ডাকের মধ্যে, অতঃপর ব্রাহ্মণের পিছনে পিছনে জল থেকে উঠে এলো উমা।

একবার চারিদিকে তাকালো, তখনো স্নানার্থীদের ভিড় হয়নি গঙ্গার ঘাটে।

ব্রাহ্মণ আবার বললেন, আজ আর স্নান করবো না। গঙ্গা-স্নানের চাইতেও যখন বেশী পুণ্য হলো। চলো—

অগ্রসর হলেন ব্রাহ্মণ উমার হাত ধরে।

ঘাটের ধারেই একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল।

ড্রাইভার সীটে বসেছিল।

ব্রাহ্মণ গাড়ির সামনে গিয়ে পৌঁছতেই ড্রাইভার সসম্ভ্রমে নেমে গাড়ির দরজা খুলে দিল, উমাকে নিয়ে ব্রাহ্মণ গাড়িতে উঠে বসলেন।

ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল।

হরিহর চট্টোপাধ্যায় একজন রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট এ্যাণ্ড সেসনস্ জজ।

প্রত্যহ রাত থাকতে গাড়িতে করে গঙ্গায় স্নান করতে আসতেন এবং স্নানার্থীদের ভিড় হওয়ার আগেই স্নান সেরে, গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়েই আহ্নিক সেরে নিতেন।

সেদিনও স্নান করবেন বলে গঙ্গার ঘাটে পৌঁছে সবে জলে পা দিয়েছেন এমন সময় উমার প্রতি তাঁর নজর পড়ে।

তিনি ও উমা ছাড়া সে সময় গঙ্গার ঘাটে তৃতীয় কোন প্রাণী ছিল না।

উমা সোজা এসে গঙ্গার জলে নেমে যাচ্ছে দেখে কেমন যেন তাঁর সন্দেহ হয়। সেই সন্দেহের বশবর্তী হয়েই তিনি ডেকেছিলেন পিছন থেকে উমাকে।

এবং তাঁর সন্দেহ যে মিথ্যা নয় বুঝতে পেরেছিলেন পর মুহূর্তেই।

চলন্ত গাড়িতে বসে হরিহর শুধালেন, কি নাম তোমার মা?

উমা চৌধুরী।

কোথায় থাক ?

উমা নীরব।

কোন জবাব দেয় না।

মৃদু হেসে হরিহর বললেন, বুঝতে পেরেছি জবাব দেবে না। আর এও বুঝতে পারছি স্বামীর কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করলেও জবাব পাবো না। তাই তো—

পূর্ব্ববৎ নীরব উমা।

তুমি কোথায় থাক্ বলতে তোমার আপত্তি থাকে আমি জানতে চাই না উমা, কিন্তু কোথায় নামবে বল, তোমার বাড়িতে না শ্বশুর-বাড়িতে, সেইখানেই তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসবে আমার ড্রাইভার—আমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে।

উমা এবার মুখ তুলে হরিহরের দিকে তাকালো।

দুই-চোখ তার জলে টল টল করছে, আপনি আমাকে মরতে দিলেন না, কিন্তু এ পৃথিবীতে আমার থাকবার কোন জায়গা নেই বলেই গঙ্গায় আশ্রয় নিতে চলেছিলাম।

প্রসন্ন হাসিতে হরিহরের মুখখানা ভরে উঠলো।

বললেন, তা কি আর আমি বুঝতে পারিনি মা। একটা কথা বলবো মা।

উমা মুখ তুলে নিঃশব্দে তাকাল।

আমার গৃহে যদি তোমার থাকতে আপত্তি না থাকে তো আমার ওখানেই চল আপাততঃ, তারপর যা হয় একটা ব্যবস্থা পরে ভেবেচিন্তে করা যাবে।

হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের সংসারটি ছোট।

একমাত্র পুত্র, পুত্রবধূ, হরিহরের স্ত্রী এবং তিনি নিজে।

গঙ্গার ঘাট থেকে কোথাকার কে একটা মেয়েলোককে হুট্ করে বাড়িতে এনে তোলায় হরিহরের স্ত্রী অন্নপূর্ণা প্রথমটায় স্বামীর প্রতি একটু বিরক্তিই বোধ করেছিলেন।

মুখের কথায় মনের অসন্তোষটা ঢাকাও থাকেনি। কিন্তু স্বামী হরিহরকে তিনি দীর্ঘকাল ধরেই চেনেন, একবার যেটা স্থির করেন হরিহর তার পরে কারো কোন মতামতই তিনি সহ্য করেন না এবং কানও দেন না।

তাছাড়া হরিহর যখন বললেন, বৌমা আমাদের আসন্ন সন্তান-সম্ভবা, সন্তান হবার পর তাকেও তো কিছুদিন দেখাশোনা করার জন্য একজনকে রাখতে হবে! তুমি তো ওসব দিকেই যাবে না।

কথাটা মিথ্যা নয়।

অতিশয় ছুঁচিবাই অন্নপূর্ণা। দিনের মধ্যে দশবার কাপড় বদলাচ্ছেন, স্নান করছেন।

আপাততঃ সরমার অজুহাতেই উমা ঐ গৃহে স্থান পেয়ে গেল।

কিন্তু উমা বুঝি যাদু জানতো।

হরিহরের হৃদয় তো আগেই জয় করেছিল, এক মাস না যেতে অন্নপূর্ণা ও সরমারও হৃদয় জয় করে নিল।

উমা না হলে একদণ্ড কারো চলে না।

সরমার স্বামী কৃষ্ণকান্ত—তিনি বাপের মতই শান্তশিষ্ট ও হৃদয়বান, তিনি কোন সাতেও ছিলেন না পাঁচেও ছিলেন না সংসারের।

কিন্তু অলক্ষ্যে ভাগ্যবিধাতা বুঝি উমাকে হরিহরের গৃহে তার নিশ্চিন্ত আশ্রয়েই এনে তুলেছিলেন।

দেড় মাস পরে একটি কন্যাসন্তান প্রসব করে সরমা নিদারুণ অসুস্থ হয়ে পড়লো।

উমা তখন সরমার নবজাত মেয়েটিকে তো বুকে তুলে নিলই, সেই সঙ্গে অসুস্থ সরমার সমস্ত সেবার ভারও বুক দিয়ে করতে লাগলো দিবারাত্র এবং তারই মধ্যে সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটি কাজ; কারণ উমা আসার পর সংসারের সমস্ত কাজের ভার একটু একটু করে তারই কাঁধে গিয়ে পড়েছিল।

সরমার মেয়ের নাম রেখেছিল উমা, গৌরী।

গৌরীকে নাওয়ায় ধোওয়ায়, কাজল পরায়, খাওয়ায়, উমার

বুকটা যেন ভরে যায়।

নিজের গর্ভের সন্তানকে ভাগ্যচক্রে বিসর্জন দিয়ে মনের মধ্যে উমার যে বুভুক্ষিত মাতৃত্ব সর্বক্ষণ গোপন অশ্রু বিসর্জন করছিল গৌরীকে বুকে পেয়ে যেন সে বুভুক্ষা প্রশমিত হলো।

প্রদীপকে কুড়িয়ে পাওয়ার মাস দুই পরে একদিন অমিতা দ্বিপ্রহরে তার নিজের ঘরে বসে কি একটা বই পড়ছে।

পাশেই ক্র্যাডেলে ঘুমিয়ে প্রদীপ। ভিখারিণী উমার পরিচয়হীন পরিত্যক্ত সন্তান নয়, রাজেন্দ্রানী অমিতার আদরের ধন প্রদীপকুমার।

দরজার বাইরে অচিন্ত্যর গলা শোনা গেল, আসতে পারি।

কে?

আমি অচিন্ত্য।

এসো, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?

অচিন্ত্য এসে ঘরে ঢুকল। একবার অদূরে ক্র্যাডেলে শায়িত ঘুমন্ত শিশুটির দিকে আড়চোখে তাকাল।

কিছু বলবে অচিন্ত্য?

কিছু টাকার দরকার।

টাকা।

হ্যাঁ, বেশী নয় হাজার দুই—

দু'হাজার টাকা?

আপাতঃত দু'হাজার হলেই চলবে।

কিন্তু হাতে তো অত টাকা নেই!

হাতে না থাকলেও ব্যাংকে আছে। একটা না হয় বেয়ারার চেকই দাও।

বেয়ারার চেক!

হ্যাঁ।

অমিতা ক্ষণকাল যেন কি ভাবলো তারপর বললে, আসচি, বোস।

সত্যিই অমিতা দুই হাজার টাকার একটা চেক্ এনে ওকে দিলো।

কিন্তু মাসখানেকও গেল না আবার অচিন্ত্যর টাকার প্রয়োজন হলো।

এবারে অমিতা বললে, এভাবে তো চলতে পারে না অচিন্ত্য—

চলতে পারে না বুঝি।

না।

অচিন্ত্য হাসলো।

সত্যই চলতে পারে না।

কেন বলতো? অচিন্ত্য শুধায়।

কারণ তুমি আমাকে ব্ল্যাক মেইল করছো।

না, না—

আমি শিশু নই অচিন্ত্য। শোন, টাকা আমি তোমাকে এবার দেবো কিন্তু তার আগে আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটা চুক্তি হওয়া দরকার।

চুক্তি!

হ্যাঁ।

কি চুক্তি?

কত টাকা তোমাকে দিতে হবে বলো। কিন্তু তার আগে যা বললাম—একটা চুক্তি হবে আর কখনো তুমি টাকা তো চাইতেই পারবে না এবং শুধু তাই নয়, এ বাড়ি ছেড়েও তোমাকে চলে যেতে হবে।

চলে যেতে হবে?

হ্যাঁ।

অচিন্ত্য অতঃপর কি যেন মুহূর্তকাল ভাবলো। তারপর বললে, বেশ! তাই হবে।

এবার বল কত চাও।

বিশ হাজার চাই।

বিশ হাজার ?

হ্যাঁ।

অমিতা ক্ষণকাল অতঃপর চুপ করে থাকে তারপর বলে, বেশ তাই হবে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখ।

কি ?

চুক্তি যদি ভঙ্গো করো তবে—

তবে কি !

অমিতা তোমকে ক্ষমা করবে না।

বেশ।

অমিতা তাকে বিশ হাজার টাকাই দিল এবং ঐ দিনই অচিন্ত্য চিরদিনের মত চৌধুরী বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

সরমা কিন্তু আর সুস্থ হয়েই উঠতে পারলো না।

ফলে উমার বুকেই গৌরী তার নিজের সন্তানের মতই লালিত হতে লাগলো।

উমার স্থান হরিহরের গৃহে কায়েমী হয়ে গেল।

॥ তেরো ॥

দীর্ঘ দুই বছর বাদে ব্যারিস্টার হয়ে একদিন হিমাদ্রি ফিরে এলো।

ইতিমধ্যে অমিতার বাবার মৃত্যু হয়েছিল।

স্টেশনে নেমে অমিতাকে প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়ালো হিমাদ্রি।

অমিতার কোলে ফুটফুটে একটি বছর দেড়েকের ছেলে।

হিমাদ্রির মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়।

যাই হোক রাস্তায় গাড়িতে বিশেষ কোন কথাবার্তা হলো না হিমাদ্রির অমিতার সঙ্গে।

কেবল হিমাদ্রি লক্ষ্য করলো অমিতা যেন সযত্নে তার স্পর্শ বাঁচিয়ে চলেছে।

বাড়িতে এসে পোঁছে দেখলো অমিতার ঐ কুড়ানো নাম গোত্রহীন ছেলে—প্রদীপ তার গৃহের অনেকখানি জুড়ে বসেছে।

কি জানি কেন হিমাদ্রির মন বিরক্ত হয়ে উঠতে থাকে।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর লাইব্রেরী ঘরে বসে যখন সে পাইপ টানতে টানতে ভাবছিল অমিতার সঙ্গে ঐ ছেলের ব্যাপার নিয়ে একটা বোঝাপড়া করতে হবে, প্রদীপকে ঘুম পাড়িয়ে অমিতা এসে লাইব্রেরী ঘরে ঢুকলো।

দীর্ঘ দুই বছর পরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিভৃতে দেখা কিন্তু অমিতা এসে হিমাদ্রির সোফার পাশে জায়গা থাকলেও মুখোমুখি অন্য সোফায় বসলো।

একটু যেন বিস্মিত হয়েই হিমাদ্রি স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালো।

বিস্মিত হলেও এবং প্রথম কয়েকটা মুহূর্ত একটু ইতস্ততঃ করে সোফা থেকে উঠে গিয়ে উপবিষ্ট অমিতার হাতটা ধরবার চেষ্টা করতেই অমিতা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, না—

হঠাৎ যেন ধাক্কা খেয়ে থমকে দাঁড়ায় হিমাদ্রি। কয়েকটা মুহূর্ত কোন বাক্য সরে না তার মুখে। তারপর বলে, কি না?

আমাকে তুমি স্পর্শ কারো না!

হতবাক হিমাদ্রি। বলে, স্পর্শ করবো না!

না। আমি একটা ব্রত নিয়েছি।

ব্রত!

বিস্ময়ের অবধি বুঝি থাকে না হিমাদ্রির।

লরেটোতে পড়া, চিরদিনের অতি উগ্র আধুনিকা মেয়ে অমিতা ব্রত নিয়েছে।

বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে স্ত্রীর মুখের দিকে হিমাদ্রি।

হ্যাঁ, ব্রত। যতদিন না শেষ হবে আমরা পরস্পরকে স্পর্শ পর্যন্ত করবো না।

অমু, এসব তুমি কি বলছো! কিসের ব্রত, আর কেনই বা এ ব্রত?

আমি পাপ করেছি, অমিতা বলে।

পাপ!

বিস্ময়ে তাকায় হিমাদ্রি স্ত্রীর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

অমিতা বলে, হ্যাঁ, পাপ।

আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না অমিতা।

বললাম তো, অজ্ঞাতে এক মহাপাপ করেছি আমি।

মহাপাপ!

হ্যাঁ, তার থেকে মুক্তি পেতেই হবে আমাকে—তুমি; তুমি—আমাকে ক্ষমা করো।

বলতে বলতে দুই চোখের কোল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে ফোঁটায় ফোঁটায় অমিতার।

পাথরের মতই যেন অতঃপর দাঁড়িয়ে থাকে হিমাদ্রি।

হঠাৎ অমিতা উঠে দাঁড়ায়। বোধ করি ঘর ছেড়ে চলে যাবার জন্যই।

অমিতা, শোন—

বল।

একটা কথার আমার জবাব দেবে?

কি?

জানি না আমি অজ্ঞাতে তোমার প্রতি কোন অবিচার করেছি কিনা—

না, না—

যদি করে থাকি অন্ততঃ আমাকে জানতে দাও সেটা—

ক্ষমা করো, আমি, আমি—তোমার ঐ প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না।

কথাটা বলে আর অমিতা দাঁড়ালো না।

ঘর ছেড়ে চলে গেল।

রাত্রে হিমাদ্রি দেখলো পৃথক শয্যা রচিত হয়েছে দু'জনার জন্য দুই ঘরে।

অমিতাই শুধু প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল হিমাদ্রিকে তাই নয়, হিমাদ্রিও বুঝি ইতিমধ্যে ভালবেসেছিল অমিতাকে।

আর সেই কারণেই প্রচণ্ড অভিমানে হিমাদ্রি অমিতাকে আর দ্বিতীয় অনুরোধ জানাল না।

মনে মনে বলে হিমাদ্রি, তাই, তাই হোক—অমিতা যদি তাই চায় তো তাই হোক।

॥ চৌদ্দ ॥

দীর্ঘ বাইশ বছর পরে।

এই বাইশ বছরে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে।

হরিহরের সংসারে আজ হরিহরও নেই, তাঁর স্ত্রী অন্নপূর্ণাও নেই।

গৌরীর মা সরমা আজও পঙ্গু, শয্যাশায়িনী হয়েই বেঁচে আছে।

সংসারের প্রাণীদের মধ্যে পঙ্গু শয্যাশায়িনী সরমা, গৌরীর বাবা কৃষ্ণকান্তবাবু, আর গৌরী।

গৌরীর বড়মা উমা।

উমাকে গৌরী বড়মা বলেই ডাকে।

উমার বয়স হয়েছে বটে কিন্তু এখনো তার চুলে পাক ধরেনি।

তার সমস্ত দেহ ও মুখ দিয়ে যেন একটা তপস্যার জ্যোতি বের হয়।

পরিধানে লাল পাড় শাড়ি, হাতে একগাছি করে মাত্র শাঁখা, কপালে ও সিঁথিতে সিঁদুর, মাথার চুল রুক্ষ।

তেইশ বছর উমা আজ মাথায় তেল দেয় না।

উমাকে দেখলে মনে হয় যেন তপস্যাক্লিষ্ট গৌরী।

নিজের মার সঙ্গে গৌরীর কোন দিনই একটা সম্পর্ক নেই।

তার যা কিছু আব্দার ঐ উমা—তার বড় মার কাছেই।

হরিহরের গৃহে স্থান পাবার পর মাস কয়েক বাদে একদিন অন্নপূর্ণার সঙ্গে গাড়িতে করে গঙ্গাস্নানে যেতে যেতে একটা ব্যাপার আবিষ্কার করেছিল উমা আকস্মিক ভাবেই, একই পাড়ায়, একই রাস্তায় মাত্র খানকয়েক বাড়ির ব্যবধানেই এ্যাডভোকেট যতিশঙ্কর চৌধুরীর বিরাট গৃহটা।

সে যেন এক বিস্ময়কর আনন্দানুভূতি উমার।

তারপর থেকেই উমার কাজ হয়েছিল অন্নপূর্ণাকে জোর করে সঙ্গে নিয়ে নিয়ে নিয়মিত গঙ্গাস্নানে যাওয়া এবং যাতায়াতের পথে সতৃষ্ণ-নয়নে চেয়ে থাকতো উমা ঐ বিরাট বাড়িটার দিকে।

ঐ বাড়িতেই তার খোকন, সোনার খোকন, বুকজোড়া মানিক রয়েছে।

সে দিনও সকাল বেলা গঙ্গাস্নান করে ঘরে ফিরছিল উমা।

হরিহর বাবু সঙ্গে সেদিন ছিলেন না।

কয়েক দিন থেকেই তাঁর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

বাতের ব্যাধিটা ইদানীং প্রায়ই তাকে অসুস্থ করছিল, তাই গত কয়েক দিন ধরে বাধ্য হয়েই তাকে গঙ্গাস্নান বন্ধ করতে হয়েছিল।

কিন্তু উমার আকর্ষণটা তো গঙ্গা নয়, তার সন্তান।

যাতায়াতের পথেই যে সেই সন্তান থাকে; তাই ঝড় জল কিছুতেই উমার গঙ্গাস্নান বন্ধ থাকতো না।

তা ছাড়া ছেলেকে, তার খোকনকে চৌধুরী বাড়ীর গেটের সামনে সেই যে এক শেষরাত্রে মাস দুই পূর্বে নামিয়ে রেখে গিয়েছিল, এখনও পর্যন্ত জানতে পারেনি সেই খোকনকে অমিতা কি ভাবে গ্রহণ করল।

তাই মায়ের মনে দুঃশ্চিন্তাটা সর্বক্ষণ থেকে পীড়ন করছিল।

সেদিন যখন গঙ্গাস্নান করে ফিরছে হঠাৎ নজরে পড়লো মধ্য-বয়েসী এক ভৃত্য চৌধুরী বাড়ির এক গেট দিয়ে একটি দামী

প্যারামবুলেটার ঠেলতে ঠেলতে বের হয়ে এলো।

প্যারামবুলেটারটা যখন কাছাকাছি এসেছে পায়ে পায়ে উমা প্যারামবুলেটারের সামনে এগিয়ে গেল।

ভাগ্যের কি ক্রূর পরিহাস! দু'শ গজের মধ্যে থেকেও মা ও ছেলের মধ্যে মুখ দেখাদেখি নেই।

ঐ তো, ঐ তো তার খোকন। দামী বেশভূষা আজ গায়ে খোকনের। চোখে কাজল, গলায় সোনার হার, হাতে সোনার বালা। হাত পা নেড়ে নেড়ে খেলছে খোকন প্যারামবুলেটারের ভিতরে শুয়ে।

মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে উমা, কাদের ছেলে?

দাসী বলে, ব্যারিস্টার সাহেবের।

দু'চোখে জল ভরে আসে উমার।

ব্যারিস্টার সাহেবের ছেলে।

অমিতা তাহ'লে তাকে বুকে তুলে নিয়েছে। তার খোকন, অভাগিনীর সন্তান খোকন তাহলে মার স্নেহ পেয়েছে।

সহসা ঐ সময় বাড়ির ভিতর থেকে অমিতার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, সুধা, খোকনকে নিয়ে আয়—

উমা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দেয়।

তারপরও কতবার দেখেছে তার খোকনকে।

দুঃখিনী মায়ের সন্তান সে আজ আর নয়—রাজরাজেশ্বর।

এই ভাল হয়েছে ঠাকুর, এই ভাল হয়েছে, খোকন তার নিজের ঘরে স্থান পেয়েছে।

নাই বা পেল বুকে সে তার খোকনকে, খোকন তো তার সুখে আছে।

বার বার প্রণাম জানিয়েছে ভগবানকে উমা কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে।

আর আশীর্বাদ করেছে অমিতাকে।

হরিহরের মৃত্যুর পর কৃষ্ণকান্ত বাধ্য হয়ে গাড়ি বেচে দিয়েছেন।

মাসান্তে কেরানীগিরি করে চার'শ টাকা মাইনায় গাড়ি চালানো যায় না।

ভাগ্যে পৈত্রিক বাড়িটা ছিল তাই কোনমতে চলে যাচ্ছিলো চারটি প্রাণীর।

উমা তো একবেলা মাত্র আহার করতো।

কৃষ্ণকান্তর স্ত্রী বেঁচে থাকলেও সংসারের যাবতীয় কর্তৃত্ব একে একে গিয়ে বড়মা উমার হাতেই পড়েছিল।

কৃষ্ণকান্তর সংসারের কর্ত্রী আজ উমাই।

কৃষ্ণকান্ত উমাকে নাম ধরেই ডাকতেন।

সরমা ডাকতো দিদি এবং উমা কৃষ্ণকান্তকে দাদা বলে ডাকতো।

উমার কাছেই মানুষ বলে গৌরীর যা আদর আব্দার ছিল উমার কাছেই।

আই. এস-সি. পাশ করার পর হঠাৎ গৌরী জিদ ধরে ডাক্তারি পড়বে।

কৃষ্ণকান্ত প্রথমে মত দিতে চাননি।

সামান্য চারশ টাকা বেতনে সংসার চালিয়ে, চিররুগ্না স্ত্রীর হেফাজত ও চিকিৎসা করে মেয়েকে ডাক্তারি পড়াবার খরচ যোগানো সোজা নয়।

কিন্তু গৌরীর ইচ্ছা সে ডাক্তারি পড়বে। তা সে যেমন করেই হোক।

অথচ গৌরী জানত বাবাকে বললে তিনি রাজী হবেন না। সে তাই উমাকে গিয়ে ধরল।

উমার কথা যে এসংসারে কেউ ফেলবে না সেটা গৌরীর অবিদিত ছিল না।

উমা রন্ধনশালায় রান্না করছিল গৌরী পিছন থেকে এসে উমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তার পিঠে মুখ গুঁজলো, বড়মা—

ওরে করিস কি পুড়ে মরব যে দু'জনেই—সর সর—

কোন কথা আমি শুনতে চাই না, আগে বল যা চাইবো তা দেবে—

কি শুনি ?

উহুঁ, আগে বল, কথা দাও—

কিন্তু, কি বলবি তো ?

আগে বল।

আচ্ছা, আচ্ছা—বল।

আমি ডাক্তারি পড়বো।

তা বেশ তো—পড়বি—

বাবা রাজী হচ্ছে না।

আচ্ছা সে হবে'খন। এখন সর দেখি, তরকারিটা পুড়ে গেল।

গৌরী উমার কাছ থেকে কথা পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল।

সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে ফিরে ঘরে চৌকির উপর বসে কৃষ্ণকান্ত যখন চা খাচ্ছেন উমা কথাটা পাড়ল।

বললে, ও যখন ডাক্তারি পড়তে চাইছে তাই না হয় পড়ুক।

কিন্তু দিদি আমার এই অবস্থা, ও খরচ কি সোজা।

তা হোক, মেয়েটার যখন এত ইচ্ছা ডাক্তারি পড়বার, এক রকম করে হয়ে যাবে। তুমি আর অমত করো না দাদা।

তা যেন করবো না, কিন্তু এক রকম যে কি রকম করে হবে তাই ভাবছি।

হবে, হবে—

বেশ। তুমিও যখন বলছো।

হ্যাঁ, পড়ুক ডাক্তারিই—

শেষ পর্যন্ত উমার অনুরোধে কৃষ্ণকান্তই মেয়েকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করে দিলেন!

॥ পনেরো ॥

সেই মেডিক্যাল কলেজেই একদিন আকস্মিকভাবে প্রদীপের সঙ্গে গৌরীর পরিচয় হয়ে গেল।

গৌরীর যখন সেকেণ্ড ইয়ার, প্রদীপের তখন ফোর্থ ইয়ার।

কলেজের একটা কালচারাল ফাংশনে ছাত্র-ছাত্রীরা স্বরচিত কবিতা পাঠ করে, গান করে।

গৌরীর নিজের লেখা এবং নিজেরই সুর দেওয়া গান 'তপস্বিনী গৌরী'ই বিচারকদের বিচারে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

সে গান শুনে প্রদীপ মুগ্ধ হয়ে ফাংশনের পরে যেচে গৌরীর সঙ্গে আলাপ করে কলেজ করিডরে।

গৌরী দেবী!

গৌরী ফিরে তাকায় প্রদীপের দিকে।

চমৎকার হয়েছে—

কি?

চমৎকার হয়েছে গৌরী দেবী আপনার স্বরচিত গান। প্রদীপ বলে।

আপনার ভাল লেগেছে? গৌরী শুধায়।

এত ভাল লেগেছে যে ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। আপনার গানটা শুনতে শুনতে কি মনে হচ্ছিল জানেন?

কি?

যেন সত্যিই তপস্বিনী হিমালয় দুহিতাকে সামনে রেখে তার প্রশস্তি রচনা করেছেন আপনি।

সত্যিই তাই। আমার বড় মাই আমার তপস্বিনী গৌরী।

বড়মা!

হ্যাঁ, আমার বড়মা। চব্বিশ বছর তিনি একবেলা আহার করেন, চুলে তেল দেন না, শুধু হাতে শাঁখা আর মাথায় সিঁদুর—

কেন ?

মার মুখে শুনেছি বড়মা তাঁর স্বামীর মঙ্গল কামনায় নাকি এমনি করে চব্বিশ বছর ধরে তপস্বিনীর জীবন যাপন করছেন—

কেন তাঁর স্বামী—

কেউ জানে না তিনি কোথায়।

আপনার মুখে আপনার বড়মার কথা শুনে একটিবার তাঁকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। কোথায় আপনারা থাকেন ?

ল্যান্সডাউনে—

সে কি, ল্যান্সডাউনে যে আমরাও থাকি। কত নম্বর বাড়ি বলুন তো আপনাদের ?

দেখা গেল দু'জনের বাড়ি খুবই কাছাকাছি।

যাবো একদিন আপনাদের বাড়ি আমি।

সত্যি যাবেন ?

যাবো। অন্তত তাঁকে দেখবার জন্যও আমি যাবো। আশ্চর্য !

কি ?

আজকের দিনে এমনও হয়।

প্রদীপ কলেজের সেরা ছেলে।

বরাবর বৃত্তি স্বর্ণপদক নিয়ে পাস করেছে। শুধু লেখাপড়াতেই নয়, খেলাধূলাতেও কলেজে তার সমকক্ষ কেউ নেই।

এদিকে ঐ পরিচয় থেকেই প্রদীপ আর গৌরী দুজনা দুজনার কাছে ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

কিন্তু প্রদীপের আর গৌরীদের বাড়িতে যাওয়া হয়ে ওঠে না।

গৌরী বড়মার কাছে প্রদীপের গল্প করে।

বলে, যেমন বড়লোকের ছেলে, তেমনি কলেজের আমাদের সেরা ছাত্র বড় মা।

মৃদু হেসে উমা বলে, তাই নাকি!

হ্যাঁ গো, তুমি দেখলে না, একেবারে যাকে বলে simply charm হয়ে যাবে।

হাসতে হাসতে উমা বলে, তা গৌরী যখন আমার চার্ম হয়েছে—

যাঃ কি যে বল!

লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে গৌরীর মুখখানি।

তা হ্যাঁরে একদিন নিয়ে আয় না তাকে এখানে!

বলেছে অনেকবার তোমাকে একবার দেখতে আসবে—

আমাকে দেখতে? সে কি রে—

হ্যাঁ। বলিনি তোমাকে আমার লেখা সেই 'তপস্বিনী গৌরী' গান শুনেই তো তোমাকে দেখতে চেয়েছিল।

তাই নাকি, তা কই এলো না তো।

যা ভুলো মন আর দশরকম খেয়াল নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত—মনেই থাকে না হয়তো।

তা তুই বললেও তো পারিস।

কেন, বার বার আমি সাধতে যাবো কেন! আমার একটা প্রেস্‌টিজ নেই। আমরা না হয় গরীব আছি, সে না হয় বড়লোক ব্যারিস্টারের একমাত্র ছেলে, তাই বলে—

কে বললে গৌরী আমার গরীব?

গরীব নয় বুঝি! জান ওদের তিনখানা গাড়ি। আর বেশভূষার বাহার যদি দেখ না, নিত্য স্যুট—নিত্য নতুন টাই—তা থাক্‌গে, তারা বড়লোক, তাই বলে গরীব বলে কি আমরা মানুষ নই নাকি যে বার বার সাধতে যাবো!

গৌরীর অভিমান হয়েছে উমা বুঝতে পারে।

মৃদু হেসে বলে, তা না হয় সাধবিই—

বয়ে গেছে আমার।

কিন্তু ঘটনাচক্রে একদিন প্রদীপ আকস্মিকভাবেই এসে পড়লো গৌরীদের বাড়িতে।

॥ ষোল ॥

যেদিন গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে আকস্মিকভাবেই জানতে পেরেছিল উমা, হিমাদ্রির বাড়ি ঐ পাড়াতে এবং একই রাস্তায় এবং হরিহরের বাড়ির কয়েকখানা বাড়ির পরেই, সেই দিন থেকেই গঙ্গায় প্রত্যহ ভোরে আসা যাওয়ার পথে সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে চেয়ে দেখতো বিরাট গেটওয়ালা বাড়িটার দিকে উমা।

যতদিন হরিহরের সঙ্গে তাঁর গাড়িতে গিয়েছে চলন্ত গাড়ি থেকে ক্ষণিক দেখায় তৃষ্ণা তার মেটেনি; তাই হরিহরের মৃত্যুর পরও তার গঙ্গাস্নান বন্ধ করেনি।

প্রত্যহ ভোরে হাঁটতে হাঁটতে ঐ পথ ধরে উমা গঙ্গায় যেতো এবং ফিরে আসতো আর যাওয়া-আসার পথে ঐ বাড়ির কাছাকাছি এলেই আপনা থেকেই যেন তার চলার গতি মন্থর হয়ে আসতো।

বাড়িটার দিকে চেয়ে যেন বুভুক্ষু উমার কিছুতেই আশা মিটতো না।

কতদিন অন্যমনস্কভাবে হোঁচট খেয়ে পায়েতে আঘাত পেয়েছে।

ঐ বাড়িতেই আছে তার স্বামী হিমাদ্রি, আছে তার নাড়িছেঁড়া ধন যাকে মা হয়েও বুকে রাখতে পারেনি, তার খোকন।

ভগবানকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়েছে উমা।

স্বামী তাকে না গ্রহণ করুন, ছেলেকে সে বুকে নাই নিতে পারুক, তবু তো তারা তার চোখের উপরেই রয়েছে।

সত্যিই ভগবানের করুণার অন্ত নেই। নচেৎ এত কাছাকাছি হরিহরের গৃহেই বা সে স্থান পাবে কেন?

সে তো এ জীবন শেষ করেই দিতে গিয়েছিল গঙ্গার জলে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে।

জীবনকে মনে হয়েছিল মিথ্যা।

আজ কেন মনে হয় জীবন মিথ্যা নয়—শুধু স্বপ্নই নয়।

ইদানীং শরীরটা কিছুদিন থেকেই বড় যেন দুর্বল হয়ে পড়েছিল উমার।

মধ্যে মধ্যে মাথা ঘোরে। কিন্তু কাউকে সে-কথা সে জানতে দেয়নি।

অনেকটা পথ গঙ্গায় যেতে আসতে বড় কষ্ট হয় তবু গঙ্গাস্নানের প্রলোভন উমা ত্যাগ করতে পারে না।

অবিশ্যি হিমাদ্রির বাড়িটা দেখা ছাড়াও আর একটা নতুন প্রলোভনে পড়েছিল উমা।

কিছুদিন ধরে ফেরবার পথে তার ছেলে প্রদীপকে দেখছিল, ভোরের বেলায় গাড়িতে করে কোথায় যেন বের হয় সে।

উমা জানত না পরীক্ষা কাছে এসে পড়েছে বলে প্রদীপ ভোরে ঐ সময় এক বন্ধুর বাড়িতে কিছুদিন ধরে পড়তে যেতো—তারপর সেখান থেকেই কলেজে চলে যেতো।

সেদিনও উমা গঙ্গাস্নান করে ফিরছিল। বাড়ির কাছাকাছি এসে হঠাৎ কেমন মাথা ঘুরে পড়ে গেল।

প্রদীপও ঠিক ঐ সময় গাড়ি করে যাচ্ছিল।

পথে ঐ সময় দ্বিতীয় কোন লোকজন ছিল না।

দূর থেকে নেমে ছুটে এসে উমাকে রাস্তা থেকে তুলে ধরল।

পড়ে গেলেন কেন হঠাৎ?

মাথাটা কেমন যেন ঘুরে উঠেছিল। মৃদুকণ্ঠে কথাটা বলেই প্রদীপের মুখের দিকে চেয়ে উমা যেন স্তব্ধ হয়ে যায়।

এখন কেমন বোধ করছেন?

ভাল। তোমার—তোমার—নাম কি বাবা?

প্রদীপশঙ্কর চৌধুরী।

প্রদীপ—চোখের দৃষ্টি যেন ঝাপ্‌সা হয়ে আসে উমার।

প্রদীপ, তার আশার প্রদীপ!

আঃ, চোখে এত জল আসে কেন!

ওঠবার চেষ্টা করে উমা।

না, না—উঠবেন না—চলুন কোথায় যাবেন। আপনাকে আমি আমার গাড়িতে করে পৌঁছে দিই—

না, না—তার আর কোন দরকার হবে না বাবা। সামান্য এ পথটুকু আমি হেঁটেই চলে যাবো। এই তো কাছেই থাকি।

না, চলুন—আপনাকে আমি পৌঁছে দেবো।

উমার সমস্ত প্রতিবাদকে একপ্রকার আগ্রাহ্য করে, জোর করেই প্রদীপ নিজের গাড়িতে তুলে নেয় উমাকে।

কতকাল, কতকাল পরে ছেলের স্পর্শ পেয়েছে উমা!

দীর্ঘ কুড়ি বছরের বুভুক্ষিতা মাতৃহৃদয়।

জুড়িয়ে গেল, উমার সর্বদেহ যেন জুড়িয়ে গেল।

অপূর্ব একটা আনন্দানুভূতিতে ক্লান্ত উমার দু'টিচক্ষু যেন বুজে আসে।

গাড়ীর পিছনের সীটে সামান্য ব্যবধানে দু'জনে বসেছে।

উমার ইচ্ছা করে দু'হাত বাড়িয়ে ছেলেকে তার বুভুক্ষিত বুকের মাঝখানটিতে একেবারে টেনে নেয়।

আদরে সোহাগে চুম্বনে চুম্বনে তাকে আচ্ছন্ন করে দেয়। চিৎকার করে বলে, ওরে, আমার মানিক, ওরে আমার যাদু, আমি তোর মা।

কিন্তু অল্প পথ চক্ষের নিমেষেই যেন ফুরিয়ে গেল।

পৌঁছে গেল গাড়ি গৌরীদের দোরগোড়ায়।

এই বাড়ি তো?

হ্যাঁ বাবা, এই বাড়ি।

প্রদীপ দরজা খুলে দেয় গাড়ির, আগে নিজে গাড়ি থেকে নেমে আসে, পরে নামে উমা।

সমস্ত দেহটা তখনও বুঝি তার কাঁপছে।

গাড়ির শব্দ পেয়ে ইতিমধ্যে গৌরীই সর্বাগ্রে দোরগোড়ায় ছুটে এসেছিল।

এত সকালে তাদের বাড়িতে কে আবার গাড়ি করে এল!

প্রথমেই প্রদীপকে দেখতে পেয়ে গৌরী সোল্লাসে বলে ওঠে, একি আপনি!

প্রদীপও দোরগোড়ায় গৌরীকে দেখে কম বিস্মিত হয়নি। বলে, আপনি!

বাঃ, এই তো আমাদের বাড়ী।—কথাটা বলতেই নজর পড়ে তার বড়মার দিকে।

গৌরী এবারে যেন একটু বিস্মিত হয়ে শুধোয়, কি ব্যাপার বড়মা?

সব জেনেও যেন উমা বলে, তোরা দুজন দুজনকে চিনিস নাকি গৌরী?

চিনি মানে। আমরা যে এক কলেজেই পড়ি। ঐ তো—

কে!

বাঃ তুমি যেন কি—উনিই তো প্রদীপ চৌধুরী।

তাই নাকি! বলে প্রদীপের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে উমা অহ্বান জানায় তার ছেলেকে, এসো বাবা, একবার ভিতরে যাবে না!

প্রদীপ বিস্ময়ে চেয়ে ছিল গৌরীর মুখ থেকে উমার পরিচয়টা পাওয়ার পরই তার মুখের দিকে।

বলে, একটু দাঁড়ান—

নত হয়ে উমার পায়ের ধুলো মাথায় নিতে নিতে বলে, আপনাকে দেখেই যেন আমার মন বলেছিল, আপনি সে-ই। গৌরী দেবীর সেই তপশ্চারিণী গিরিরাজদুহিতা উমা। গৌরী দেবীর মুখে আপনার কথা শোনা অবধি, মনে মনে কতবার প্রণাম জানিয়েছি।

বেঁচে থাক বাবা, মায়ের কোল জুড়ে চিরদিন বেঁচে থাক। রাজরাজেশ্বর হও।

না, না বড়মা, রাজরাজেশ্বর নয়।—প্রদীপ বলে ওঠে, মাও আমার ঐ কথা বলে, আমি কেবল মানুষ হয়েই বাঁচতে চাই। সেই আশীর্বাদই করুন।

গৌরী তখন পাশে দাঁড়িয়ে মিটি মিটি হাসছে। হাসতে হাসতেই বলে, এ আর তুমি কি একটা নতুন আশীর্বাদ ওঁকে করলে বড়মা, উনি তো রাজেশ্বর হয়েই জন্মেছেন—

তার মানে? প্রদীপ তাকায় গৌরীর মুখের দিকে।

মানে আবার কি। আপনারা যে মিলিয়নীয়ার কে না জানে! আর মিলিয়নীয়ার মানেই রাজা। কিন্তু বড়মা, তুমি হুট্‌ করে ওঁকে ঘরে যাবার জন্য বললে, ওঁকে তোমাদের গরীবের কুঁড়েঘরে বসতে দেবে কোথায় বল ত?

কথাটা যে মেয়ের অভিমানপ্রসূত উমা বুঝতে পেরে বলে, ওকে নিয়ে তুই ভেতরে আয় গৌরী। চা খেয়ে যাবে।

কথাটা বলে উমা আর দাঁড়াতে পারছিল না।

ক্ষণপূর্বে পুত্রের সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত স্পর্শের আনন্দানুভূতিটা যেন তখনো তার দেহে রোমাঞ্চ জাগাচ্ছিল।

কোন মতে শ্লথ-পায়ে ঘরের ভিতর চলে যায় উমা।

আর গৌরী ও প্রদীপ! তারা দুজনে তখনো দুজনার মুখের দিকে তাকিয়ে।

গৌরীর অভিমানের ব্যাপারটা যে প্রদীপও বুঝতে পারে না তা নয়।

মৃদু হেসে বলে, রাগ করেছেন আপনি বুঝতে পারছি, এতদিন আসবো আসবো বলেও একবার আসতে পারিনি, কিন্তু বিশ্বাস করুন ব্যাপারটা আমার আদৌ ইচ্ছাকৃত নয়। সত্যিই মনে থাকে না সব কথা সব সময়!

তা তো থাকবেই না। কোথায় কোন্ গরীবের কুঁড়েঘরে কে যেতে বলেছে—

ছিঃ, ব্যাপারটা আপনি এত seriously নিয়েছেন ভাবতেও পারিনি! আচ্ছা, আমি কথা দিচ্ছি আবার একদিন আসবো।

আবার হয়ত ভুলে যাবেন, কেন মিথ্যে কথা দিচ্ছেন!

না, না—ভুলবো না ভুলবো না।

ঠিক?

ঠিক। কিন্তু আজ আমি চলি। যেখানে যাচ্ছিলাম অনেক দেরি হয়ে গেল।

বাঃ রে, চা না খেয়ে যাবেন মানে? বড়মা চা করতে গিয়েছেন।

তা হোক। তিনি যেন দুঃখ না করেন, তাঁকে বলে দিও, মানে বলে দেবেন—

হেসে ফেলে গৌরী বলে, বেশ তো বলেছিলেন দিও হঠাৎ আবার দেবেন কেন!

প্রদীপও হেসে ফেলে।

বেশ, তাই হবে। তবে তুমিও কিন্তু—

কি?

তুমি বলবে।

তুমি বলবো?

হ্যাঁ, আর তাহলেই আমিও বলবো তুমি। কেমন, রাজী?

বেশ, রাজী। চল, এবারে ভিতরে চল।

গৌরী মৃদু হেসে মাথাটা নীচু করে মৃদুকণ্ঠে বলে।

আজ নয়, প্লিজ, আর এক দিন।

কিন্তু বড়মা দুঃখ পাবেন।

তুমি বুঝিয়ে বলো।

প্রদীপ আর দাঁড়ালো না, গাড়ীতে উঠে ড্রাইভারকে স্টার্ট দিতে বললো।

॥ সতেরো ॥

হিমাদ্রির গৃহে তার সংসারে ছিল যেন দু'টি দিক।

একদিকে হিমাদ্রি একা। একক, নিঃসঙ্গ। সে তার আদালত মামলা নথিপত্র এবং অর্থোপার্জন নিয়ে সর্বক্ষণ যেন ব্যস্ত।

অন্য দিকে, অমিতা ও তার ছেলে প্রদীপ।

বিলেত থেকে আসার পর অমিতা যখন পৃথক শয়নের ব্যবস্থা করেছিল, হিমাদ্রির অভিমান ও আত্মমর্যাদায় ব্যাপারটা আঘাত করলেও ঘটনাটাতে ততটা গুরুত্ব সে দেয়নি।

ভেবেছিল অমিতার বুঝি ব্যাপারটা একটা ক্ষণিকেরই খেয়াল। এবং খেয়ালের একদিন অবসান হবেই।

কিন্তু যত দিন যেতে লাগলো হিমাদ্রি লক্ষ্য করলো অমিতার বুঝি পরিবর্তনের কোন আশাই নেই।

স্বামীর কাছে সে আসে, বসে, কথা বলে, পরামর্শ গ্রহণ করে, তার আহারাদি সাজ পোশাকের তদারক করে কিন্তু সব কিছুই করে একটা নির্দিষ্ট ব্যবধান রেখে।

যে ব্যবধানটা ক্রমশঃ হিমাদ্রি বুঝতে পারে দুর্লঙ্ঘ্য এবং বুঝি অনতিক্রমণীয়ও।

সে ব্যবধানের অবসান ঘটানো বুঝি এ জীবনে আর তার পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রথম প্রথম কয় মাস দুরন্ত একটা অভিমানে কোন বাদ-প্রতিবাদ জানায়নি, তারপর সেই অভিমান পরিবর্তিত হয়েছিল একটা দুর্নিবার আক্রোশে।

কিন্তু অমিতা অটল স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

দীর্ঘ ছ মাস পরে একদিন কথাটা না বলে পারেনি হিমাদ্রি।

বলেছিল, এমনি করেই কি সত্যি সত্যি তা'হলে আমরা এক বাড়িতে থেকেও পৃথক হয়েই থাকব অমিতা চিরদিন?

ক্ষমা কর আমাকে, আমি নিরুপায়।

ক্ষমার কথা ছেড়ে দাও, নিরুপায় কেন সেই কথাটাই আমি জানতে চাই।

সে কথা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রো না।

আমার বিলেত যাওয়ার পর এমন কি ঘটলো এটাই আমি বুঝতে পারছি না, যার ফলে এমনি করে চিরদিনের মতই তুমি আমাকে পর করে দিলে।

পর করে দিয়েছি তোমাকে ?

এর চাইতেও পর আর কি হতে পারে বলতে পার অমিতা ?

না, ঈশ্বর জানেন, পর তোমাকে আমি করিনি। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না কিন্তু আমি তো জানি তোমার চাইতে আপনার জন কেউ আর আমার নেই।

তাই বুঝি এমনি করে দু'জনার মধ্যে যোজনব্যাপী ব্যবধান গড়ে তুলেছো! ঠিক আছে, তাই হোক, তবে দূরেই থাকবো চিরদিন তোমার কাছ থেকে।

বিশ্বাস করো তোমাকে যে কষ্ট আমাকে অনিচ্ছায় দিতে হচ্ছে তার দ্বিগুণ কষ্ট আমি পাচ্ছি।

থাক।

উঠে গিয়েছিল অতঃপর হিমাদ্রি চেয়ার ছেড়ে।

অমিতা হিমাদ্রিকে দূরে সরিয়ে দেওয়ায় হিমাদ্রির মনে একটা প্রচণ্ড অভিমানের আঘাত লেগেছিল নিঃসন্দেহে। এবং কিছুদিন প্রথম প্রথম সেই আঘাতের বেদনাতেই যেন মুহ্যমান হয়েছিল হিমাদ্রি।

কিন্তু ক্রমশঃ যত দিন যেতে থাকে সেই নিদারুণ অভিমানের বেদনার আর একটা দিক যেন হিমাদ্রির মনের মধ্যে প্রকটিত হয়ে উঠতে থাকে।

যে বাপকে সে জ্ঞান হওয়া অবধি মন ও অন্তর দিয়ে অন্ধের মত ভালবেসেছিল সেই বাপ যদি না সেদিন তাঁর অত বড় দুঃখের

ও লজ্জার কথাটা অমনি অসহায়ভাবে ছেলের কাছে অকপটে প্রকাশ করে তারই মুখাপেক্ষী হতেন, অসহায় কাকুতিতে অমনি করে না ভেঙ্গে পড়তেন, নিঃসন্দেহে হিমাদ্রি শেষপর্যন্ত উমার কথাটা বাপের কাছে প্রকাশ করতোই।

কিন্তু ঘটনাচক্রে যখন সমস্ত ব্যাপারটা উল্‌টো হয়ে গেল তখন সে অমিতাকেই স্ত্রী বলে জীবনে মেনে নেবার চেষ্টা করেছিল যদিচ উমাকে সে একদিনের জন্যও ভুলতে পারেনি।

ভুলতে তো পারেইনি উমাকে এবং সেই ভুলতে না পারার জন্যই একটা অপরাধ-বোধের অঙ্কুশ নিরন্তর যেন তার মনটাকে আঘাত ক'রে ক'রে রক্তাক্ত করেছে।

কলকাতা থেকে কতকটা সেই কারণেই যেন বিলেতে পালিয়ে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল হিমাদ্রি। এবং দীর্ঘ বিলাত-প্রবাসে একটু একটু করে অশান্ত মনটাকে শান্ত করবার চেষ্টা করেছিল। আর সেই সঙ্গে ভবিতব্যকে মেনে নেবার চেষ্টা করেছিল।

এবং বিলাত থেকে ফিরে এসেছিল সে মনকে একপ্রকার প্রস্তুত করেই যে, অমিতাকে নিয়েই সে ঘর বাঁধবার চেষ্টা করবে।

কিন্তু ফেরবার পর অমিতার ব্যবহারে মনটা তার নিজের অজ্ঞাতেই যে আবার উমার স্মৃতির মধ্যেই ফিরে যাচ্ছিল সেটাই সে বুঝতে পারেনি।

একদিকে তার প্রতি অমিতার দুর্বোধ্য ব্যবহার ও অন্যদিকে অবচেতন মনে উমার স্মৃতির দহন এই দুইয়ের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল যেন প্রদীপ। যার ফলে কোনমতেই যেন হিমাদ্রি প্রদীপকে ক্ষমার চোখে, স্নেহের চোখে দেখতে পারছিল না।

কেন যেন তার বার বার মনে হয়েছে ঐ প্রদীপ তার জীবনে এক দুষ্টগ্রহ।

কোথাকার কে একটা কুড়ানো অজাত কুজাতের ছেলেকে নিয়ে অমিতার এত বাড়াবাড়ি কিছুতেই হিমাদ্রি যেন ক্ষমার চোখে দেখতে পারছিল না।

হিমাদ্রি যে প্রদীপকে সহ্য করতে পারে না, ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপেরও সেটা বুঝতে কষ্ট হয়নি।

তাই সে সর্বদা তার বাপকে এড়িয়েই চলতো।

অমিতা যে হিমাদ্রিরই পদবী দিয়ে নিজের সন্তান বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল প্রদীপকে, সেটাও হিমাদ্রির এতটুকু মনঃপূত হয়নি।

প্রতিবাদও যে জানায়নি সে জন্য হিমাদ্রি তাও নয় কিন্তু অমিতা শুধু একটা কথাই বলেছিল, তোমার পায়ে পড়ি ঐ ব্যাপারে তুমি কোন আপত্তি ক'রো না।

কিন্তু অমিতা, এর অর্থ কি দাঁড়ায় নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারো।

বুঝতে পারি বৈকি!

কিছু বুঝতে পারো না। নইলে যার সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্রও রক্তের সম্পর্ক নেই, যার জন্মের পর্যন্ত ঠিক আছে কি না—

ছিঃ ছিঃ, চুপ করো চুপ করো। কারও জন্মকে না জেনে না শুনে এমন করে বিদ্রূপ ক'রো না, অপমান ক'রো না। আর্তকণ্ঠে বলে উঠেছিল প্রতিবাদ জানিয়ে অমিতা।

কিন্তু তাই কি সত্য নয়? তুমি কি ওকে সত্যিই কুড়িয়েই পাওনি?

পেয়েছি কিন্তু ওর জন্মের ঠিক নেই কেমন করে তুমি বলতে পারলে?

কেমন করে আবার! সহজ স্বাভাবিক বুদ্ধিতে, বিচারে—আর শুধু আমি কেন, বিশ্বজগতে সকলেই তাই বলবে।

কে কি বলবে জানি না, তার জন্য কোন আমার চিন্তাও নেই। কিন্তু আমি জানি—

কি, কি তুমি জান?

ওর জন্মের মধ্যে কোন মিথ্যা নেই, কোন পাপ নেই।

বলতে বলতে অমিতার ছু'চোখের কোল জলে ভরে যায়। এবং পরমুহূর্তেই সে স্বামীর পায়ের কাছে বসে পড়ে কান্নাঝরা স্বরে বলে, মনে করো না কেন ও আমারই সন্তান, আমারই।

যা নয়—

হ্যাঁ, হ্যাঁ--আমি বলছি ও আমারই সন্তান, নইলে ওকে আমি বুকে তুলে নিতাম না, জন্মস্বীকৃতি দিয়ে আমারই পরিচয়ে ওর পরিচয় দিতাম না।

ঐ কথার পর সত্যিই হিমাদ্রি যেন কেমন বিব্রত বোধ করেছে সহসা।

তার মুখ দিয়ে আর কোন কথা বের হয়নি।

কোন প্রতিবাদই সে আর জানাতে পারেনি।

বরং যেন মেনেই নিয়েছিল ব্যাপারটা।

কিন্তু ব্যাপারটা মেনে নিলেও কোনদিন প্রদীপকে হিমাদ্রি নিজের বলে মনে করতে পারেনি।

সেদিনকার সে হিমাদ্রির নিরুপায়তার মধ্যে, মেনে নেওয়ার মধ্যে হয়তো তার মনের কোণে আর একটি সন্তানের মুখ ভেসে উঠেছে নিজের অজ্ঞাতেই,—উমার সন্তান।

নিজের অজ্ঞাতেই যেন মনে হয়েছে তারই তো আজ সব পাওয়ার কথা, আর এ কোথাকার কে উড়ে এসে জুড়ে বসলো, আর একজনের প্রাপ্তিকে ছিনিয়ে নিল। এবং যার ফলে প্রদীপের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে উমার প্রতি, তার প্রথম-বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি, তার গর্ভের সন্তানের প্রতি যে অন্যায় আচরণ একদিন সে অনিবার্য পরিস্থিতিতে করতে বাধ্য হয়েছিল, অমিতার দিক থেকে ব্যাপারটা হয়তো তারই প্রায়শ্চিত্ত। এবং বিধাতার অভিপ্রেত প্রায়শ্চিত্ত।

বাকী জীবনটা তাকে সেই প্রায়শ্চিত্তই করতে হবে।

তবু কিন্তু মধ্যে মধ্যে মনের ভিতরে পুঞ্জীভূত অভিমানের, ক্ষোভের বুঝি অন্ত ছিল না হিমাদ্রির।

একদিন প্রদীপের মেডিকেল কলেজে পড়াশুনোর ব্যাপার নিয়ে বলেছিল হিমাদ্রি, যথেষ্ট তো করলে অমিতা একটা কুড়োনো ছেলের জন্য।

কি বললে, কুড়োনো ছেলে ?

অমিতার মুখের দিকে তাকাল হিমাদ্রি, কথাটা কি মিথ্যা ?

নিঃশব্দে অমিতা চেয়ে থাকে হিমাদ্রির মুখের দিকে।

তাই, বলছিলাম আর কেন! এবারে এসবের ইতি করো।

ইতি করবো ?

হ্যাঁ, আর বাড়াবাড়ি করে কি হবে ? তাছাড়া এত দিন আমি কিছু বলিনি কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা আছে।

স্বামীর কথাটা শুনে কয়েক মুহূর্ত নির্বাক পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল অমিতা তারপর বলেছিল, দুর্ভাগ্য তার এবং আমারও নইলে আজ এত বড় কথাটা তোমার মুখ থেকেই বা ভগবান বের করবেন কেন ?

অমিতা!

যাক। ভালই হলো, আমারই ইতিপূর্বে সাবধান হওয়া উচিত ছিল, একটু অপেক্ষা করো—বলে অমিতা ঘর থেকে বের হয়ে যায় এবং মিনিট দশেক বাদেই ফিরে এসে পিতৃদত্ত যৌতুক গহনার বাক্সটা স্বামীর সামনে টেবিলের উপরে এনে নামিয়ে রেখে বলে, আজ পর্যন্ত প্রদীপের জন্য যা খরচ হয়েছে আশা করি এতেই তা শোধ হয়ে যাবে।

অমিতা, তুমি—

হ্যাঁ, আশা করি ওর লেখাপড়া ও অন্যান্য ব্যাপারে আজ পর্যন্ত তোমার টাকা থেকে যা খরচ করেছি এতেই তা শোধ হয়ে যাবে। অমিতা আরো বলে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, ওর মেডিকেল কলেজে পড়বার খরচও আমিই দেবো।

কথাগুলো বলে আর দাঁড়ায়নি অমিতা, ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল।

হিমাদ্রি যেন বোবা হয়ে বসে থাকে।

তুচ্ছ একটা কথা থেকে এমন একটা পরিণাত দাঁড়াবে শেষ পর্যন্ত, এ যেন হিমাদ্রির সত্যিই স্বপ্নাতীত ছিল।

মর্মপীড়ায় লজ্জায় যেন হিমাদ্রি মাটির সঙ্গে মিশে যেতে থাকে।

কিন্তু আশ্চর্য। সেদিনকার অত বড় একটা ব্যাপারের পরও অমিতার মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই।

সে যেমন ঘরে আসতো তেমনিই আসে। হিমাদ্রির প্রয়োজনের তদারক করে। তার সুখ-সুবিধার প্রতি সদাজাগ্রত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে।

কিন্তু বিশ্রী একটা অস্বোয়াস্তিতে ছটফট করতে থাকে প্রতিটি মুহূর্ত যেন হিমাদ্রি সেদিনকার সেই ঘটনার পর থেকে !

কিসের একটা লজ্জায় যেন তাকে ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকে সর্বক্ষণ, দিবারাত্রি।

মনে হতে থাকে সে যেন অমিতার কাছে অত্যন্ত ছোট হয়ে গিয়েছে।

ব্যাপারটা একটা মীমাংসার দরকার। কিন্তু ভেবে পায় না হিমাদ্রি কি ভাবে কেমন করে অমিতার কাছে কথাটা তুলবে। অতঃপর কথাটা তুলতে গিয়েও সাহস পায় না, পিছিয়ে আসে।

অমিতার অদ্ভুত কঠিন গাম্ভীর্য তাকে যেন একটা দুশ্ছেদ্য বর্মে আবরিত করে রেখেছে।

তবু একদিন বলে কথাটা হিমাদ্রি, অমিতা, মানুষকে যন্ত্রণা দেবারও বোধহয় একটা সীমা আছে—

অমিতা মুখ তুলে স্বামীর মুখের দিকে তাকায়।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি কখনো তোমার ছেলে সম্পর্কে আর কোন কথা বলবো না। ওগুলো তুমি ফিরিয়ে নাও।

না।

নেবে না ?

না। অনেক ঋণ আমার জমে আছে একজনের কাছে, কিছুটা অন্ততঃ তার আমাকে শোধ করতে দাও—

কথাটা বলতে বলতে অমিতার কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে আসে। দু'চোখের দৃষ্টি অশ্রুতে ঝাপ্সা হয়ে যায়।

হঠাৎ যেন ভূত দেখার মতই চমকে ওঠে হিমাদ্রি অমিতার শেষের কথাটায়।

কি একটা আশঙ্কায় যেন বুকের ভিতরটা দুর দুর করে কেঁপে ওঠে। গলা শুকিয়ে যায়।

অমিতা—কি, কি বলছো তুমি?

কিছু না গো, কিছু না—ঝড়ের মত ঘর থেকে বের হয়ে যায় অমিতা।

পাথরের মতই জমাট বেঁধে যেন ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে হিমাদ্রি।

তবে কি, তবে কি,—তবে কি অমিতা সব জেনেছে!

কিন্তু কেমন করে, কেমন করে তা সম্ভব!

বিলেত থেকে ফিরে আসার পর হিমাদ্রি গোপনে গোপনে অনেক অনুসন্ধান করেছিল উমার কিন্তু তার সন্ধান করতে পারেনি।

তারপর এতগুলো বছর চলে গিয়েছে।

মনে হয়েছে তাই—উমা যদি বেঁচেই থাকতো একটা খবর কি তার পেত না সে!

কিন্তু যাই হোক সেই থেকে হিমাদ্রি যেন সম্পূর্ণ বদলে যায়।

চোরের মতই সে যেন বাড়ির নীচের তলায় নিজেকে আত্মগোপন করে রাখে।

এবং যে প্রদীপের দিকে কখনো ভুলক্রমেও সে একটি মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে দেখেনি এতগুলো বছর, হঠাৎ, সেদিন লাইব্রেরী ঘরে যখন বসে আছে, প্রদীপ এসে সেখানে প্রবেশ করে ঘরের মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে চেয়ারে উপবিষ্ট হিমাদ্রিকে দেখতে পেয়ে যেমন চলে যেতে উদ্যত হয়েছে, পিছন থেকে হিমাদ্রি ডাকলো, শোন—

ভয়ে ভয়ে অত্যন্ত সংকোচে যেন ফিরে তাকালো প্রদীপ।

বাপের মুখের দিকে তাকাতেও বুঝি তার সাহস হয় না, মাথা নীচু করে থাকে।

এবারে তো তোমার ফাইন্যাল ইয়ার, তাই না?

হ্যাঁ। মাথা নীচু করে প্রদীপ মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়।

Have you decided anything ?

প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে না পেরে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় প্রদীপ বাপের মুখের দিকে।

বলছি কোন special branch of medicine-এ specialise করবে কিছু স্থির করেছো ?

ভাবছি সার্জারী—

Not a bad idea. সার্জারীতে স্পেশালাইজ করতে পারলে ভালই হবে।

আমি যাই।

যাবে ? আচ্ছা এসো।

প্রদীপ যেন হিমাদ্রির সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচে।

প্রদীপ ঘর থেকে চলে যেতে হিমাদ্রির মনে হয় ছেলেটি মন্দ নয়।

বেশ স্বাস্থ্যবান সুন্দর ছেলেটি।

দিন দুই পরে আবার সেদিন বিকালের দিকে হিমাদ্রির সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল।

টেনিস র‍্যাকেটটা হাতে নিয়ে দোলাতে দোলাতে একটা গানের সুর গুন গুন করতে করতে তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল প্রদীপ।

হিমাদ্রি সবে তখন কোর্ট থেকে ফিরেছে।

সে তার ঘরে যাচ্ছিলো।

হঠাৎ হিমাদ্রিকে সামনে দেখে গান বন্ধ হয়ে যায় প্রদীপের, গতিও মন্থর হয়ে আসে যেন আপনা হতেই সহসা।

এক পাশে মাথা নীচু করে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রদীপ।

মনোগত ইচ্ছাটা তার হিমাদ্রি চলে যাক তারপর সে যাবে।

কিন্তু হিমাদ্রিও দাঁড়িয়েই থাকে।

প্রদীপের দিকে তাকাতে তাকাতে সেই বিচিত্র আকর্ষণটা যেন একটা নেশার মতই হিমাদ্রির মনকে আচ্ছন্ন করতে থাকে।

সেই অন্ধ আকর্ষণটা যেন টানতে থাকে হিমাদ্রিকে ওই প্রদীপের দিকে।

মনে হয়, চেনা। কত চেনা যেন ঐ মুখখানা।

কোথায় কোন একখানি মুখের সঙ্গে যেন ঐ মুখখানির অদ্ভুত একটা মিল আছে।

হঠাৎ হিমাদ্রিই একসময় কথা বলে।

কাগজে দেখছিলাম আজ তুমি কলেজ ব্লু পেয়েছো। কোথায় যাচ্ছো, টেনিস খেলতে ?

আমতা আমতা করে কোনমতে প্রদীপ জবাব দেয়, ক্লাবে—

তা ক্লাবে যাও কেন, আমাদের বাড়িতেই তো লন আছে। মালীদের দিয়ে সেটাই রোল করিয়ে ঠিক করে নিলে পার। চার চারটে মালী বাড়িতে রয়েছে, ও বেটারাই বা করে কি! বলতে বলতে হাঁক দেয় হিমাদ্রি ভৃত্যের নাম ধরে, রাম, এই রাম!

প্রভুর চীৎকারে হন্তদন্ত হয়ে ভৃত্য রাম এসে সামনে দাঁড়ায়।

ডাকছিলেন ?

হ্যাঁ, মালীদের বলে দে, বাগানের টেনিস কোর্টটা যেন রোলার দিয়ে ঠিক করে রাখে। দাদাবাবু এবার থেকে বাড়িতেই টেনিস খেলবেন।

যে আজ্ঞে—

প্রদীপ কিন্তু ততক্ষণে সেখান থেকে সরে পড়েছে।

ঘরে এসে জামা কাপড় না ছেড়েই চেয়ারে বসে পড়ে হিমাদ্রি।

কিছুদিন থেকেই আজকাল একটা কথা কেন যেন ঘুরে ফিরে হিমাদ্রির মনে হয়—উমা সন্তানসম্ভাবিতা ছিল।

তার ছেলে বা মেয়ে একটা কিছু হয়তো হয়েছিল। সে আজ বেঁচে থাকলে হয়তো ঐ প্রদীপের বয়সীই হতো। এবং সেই সন্তানেরই তো তার যা কিছুর উপরে ছিল সত্যিকারের অধিকার এখানে!

আবার মনে হয় সঙ্গে সঙ্গে, বেঁচেই যদি থাকতো এবং প্রদীপের

বয়সীই যদি হতো, এসব কথা ভেবেই বা তার কি কাজ হবে। সব কিছু তো একদিন সে নিজের হাতেই মুছে দিয়েছে।

সে তো তাদের স্বীকার করে নেয়নি। সব কিছু চোরের মত গোপন করে গিয়েছে।

নিষ্পাপ একটি মেয়ে,—তার রূপে যৌবনে প্রলুব্ধ হয়ে কিছুতেই তাকে যখন করায়ত্ত করার সম্ভাবনা নেই তখন বিবাহের ফাঁদ পেতে তার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে জঘন্য এক লম্পটের মত আত্মগোপন করে একদিন পালিয়ে এসেছে, আজ তাদের কথা কোন্ লজ্জায় সে ভাবছে!

তারই নাকি আজ সে প্রায়শ্চিত্ত করছে? একটি অসহায় মেয়েকে ভালবাসার অভিনয় করে, বিবাহের অভিনয় করে একদিন তার প্রতি যে অন্যায় নিষ্ঠুর আচরণ করেছে, আজকের তার এটা যদি সেই প্রায়শ্চিত্তই হয় তো সে প্রায়শ্চিত্তেরই বা কতটুকু মূল্য!

বিবাহের অভিনয়।

বিবাহের অভিনয় ছাড়া আর কি! যে বিবাহকে সে স্বীকারই করে নেয়নি সর্বসমক্ষে, সেটা একটা অভিনয় ছাড়া তো সত্যিই আর কিছু নয়।

অভিনয়। মিথ্যা একটা প্রহসন মাত্র।

আবার মনে হয় উমা কোথায় গেল! আজও বেঁচে কি আছে সে?

কি অসহায়, কি ভীরু ছিল উমা মনে পড়ে বার বার হিমাদ্রির।

বাড়ির বাইরে কখনো পা দেয়নি যে উমা, সে যদি আজ বেঁচেও থাকে, হয়তো পথে পথে তার সন্তানটিকে নিয়ে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে।

কিম্বা হয়ত সন্তানকে তার বাঁচাতে পারেনি, সেই দুঃখে পাগল হয়ে গিয়েছে।

পাগল হয়ে হয়তো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আজ সে।

হয়ত বা বেঁচে থেকেও পয়সার অভাবে শিক্ষা পায়নি, মানুষ

হতে পারেনি—সেই সন্তান চোর, বাটপার, পকেটমার বা ভিখারী হয়েছে।

চৌধুরীবংশের সন্তান, লক্ষপতি যতিশঙ্কর চৌধুরীর পৌত্র এই শহরেরই হয়তো রাস্তায় রাস্তায় আজ পকেট মেরে রাহাজানি গুণ্ডামি করে বেড়ায়। তারই কৃতকর্মের পাপে—তারই অন্যায়ের, ভীরুতা—দুর্বলতার জের টেনে।

গাড়িতে চেপে যেতে আসতে আজকাল তাই হিমাদ্রি রাস্তার দু'ধারে ভিখারী ও পাগলী দেখলেই তাদের দিকে কি এক তৃষিত দৃষ্টিতে তাকায়।

কি এক বুভুক্ষায় যেন অচেনা সেই মুখের মধ্যে বহুদিন আগেকার পরিচিত একটি মুখের আদল খুঁজে খুঁজে বেড়ায়।

চেনে না তো, কখনো চোখেও দেখেনি তো সে সন্তানকে।

তাই মনে হয় বুঝি ওদেরই মধ্যে কোন একজন হয়তো তারই সেই আত্মজ।

কেউ তাই হাত পাতলে পকেট থেকে মুঠো করে ভিখারী প্রার্থীর হাতে টাকা পয়সা যা পারে তুলে দেয়।

প্রার্থীর হাতের মুঠোয় টাকাটা ফেলে দিতে গিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারই আত্মজ নয় তো!

ভিখারী প্রার্থী আশীর্বাদ করে, রাজা হও।

রাজা হওই বটে।

কিন্তু ওরা তো জানে না—দান করছে না সে, তার ঐ দেওয়ার মধ্যে তার কোন ঔদার্য বা বদান্যতা নেই, একজনের ন্যায্য পাওনার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশটুকুই দেবার চেষ্টা করছে মাত্র।

পুণ্যের লোভেও সে দিচ্ছে না, প্রার্থীর দুঃখে দয়ায় বিগলিত হয়েও দিচ্ছে না।

দ্বিতীয় পর্ব

॥ এক ॥

এমনি করেই বুঝি দুঃসহ এক হাহাকারের বোঝা টেনে টেনে—যে হাহাকার কাউকে বোঝাবার নয়—দিনের পর দিন ক্লান্ত, ক্লিষ্ট হয়ে পড়ে হিমাদ্রি।

সংসারের পরিবেশ থেকে—দূরে, অনেক দূরে চলে যায়।

সব থেকেও নিঃসঙ্গ জীবনের এক মর্মদাহে দিবানিশি পীড়িত হতে থাকে।

ঘুম নেই।

ঘুমোতে পারে না, রাত্রে চোখে ঘুম আসে না হিমাদ্রির।

বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, একাকী ভূতের মতো নীচে হলঘরের মতো বিরাট লাইব্রেরী ঘরটার মধ্যে পায়চারি করে করে বেড়ায় হিমাদ্রি।

আরও একটা ব্যাপারে তার নিজের কাছেই নিজের যেন বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

এতদিন যে প্রদীপের দিকে সে ফিরেও তাকায়নি, আজ সেই প্রদীপের দিকেই বারবার তাকাতে ইচ্ছা করে এবং যত তাকায়, যত তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে, আর একজনের মুখ—যাকে জীবনে কখনো দেখলো না, বেঁচে আছে কি মরেছে তাও জানে না, সেই অশরীরী কল্পনাই যেন শরীরী হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ায়।

কে, কে তুমি?

কেন, চেন না আমায়? পারছো না চিনতে? নিজের মনের দিকে তাকিয়ে দেখো, তোমারই রক্ত যে আমার এই শরীরে।

না, না—তোমাকে আমি চিনি না, চিনি না। ক্ষমা করো, অমন করে চেয়ে থেকো না আমার দিকে, যাও, তুমি যাও।

যাবো বৈকি, আগে আমার প্রাপ্য, আমাকে যা থেকে তুমি

বঞ্চিত করেছো, সব কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দাও—তারপর যাবো।

দেবো, দেবো—সর্বস্ব তুমি আমার নাও। সর্বস্ব নাও।

পাশে এসে দাঁড়ায় যেন সেই মুহূর্তে লাঞ্ছিত পর্যুদস্ত অবহেলিত এক নারীমূর্তি।

সে যেন বলে, চলে আয় খোকা! কেন হাত পাতবো ওর কাছে আমরা! চলে আয়—

যেও না, যেও না, শোন, শোন—উমা, আমি জানি আমি অন্যায় করেছি, আমি ভীরু, আমি দুর্বল, আমাকে একটা সুযোগ দাও, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।

প্রায়শ্চিত্ত, আজ তুমি প্রায়শ্চিত্তর কথা বলছো! কেমন করে আজ কথাটা বললে, কেমন করে বলতে পারলে! চলে আয়, ওর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, ও আমাদের কেউ নয়, কেউ নয়!

উমা, উমা—শোন, শোন।

অনেকদিনকার পুরনো চাকর কেশব পাশের ঘরেই থাকে।

অমিতার কড়া নির্দেশ তার উপরে, কেশব যেন সর্বদা সজাগ থাকে। বাবু একা নীচে থাকেন কখন কি প্রয়োজন হয়—

কেশবই একদিন অমিতাকে বলে, বাবু কি ঘুমোন মা! সারা রাতই তো জেগে থাকেন।

সে কি!

হ্যাঁ মা, সারারাত লাইব্রেরী ঘরে পায়চারি করেন আর কার সঙ্গে যেন বিড় বিড় করে আপনার মনে মাঝে মাঝে কথা বলেন।

কি বলছিস্ কেশব!

হ্যাঁ মা।

অমিতা কেশবকে আর কোন প্রশ্ন করে না। কিন্তু ব্যাপারটা উপেক্ষাও করতে পারে না।

সেদিন গভীর রাত্রে চুপি চুপি এক সময় নিজেই নীচে নেমে যায়। দেখে, কেশব মিথ্যা বলেনি।

সত্যিই বিনিদ্র হিমাদ্রি একা একা ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে আর করছে, আব্‌ছা আলো-ছায়ার মধ্যে।

আর মধ্যে মধ্যে, আপন মনে কি যেন বিড় বিড় করছে। আব্‌ছা আলো-ছায়ায় হিমাদ্রিকে অমিতার যেন মনে হয় অন্য এক জগতের মানুষ।

এবং স্বামীর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে এক সময় অমিতার দুই চোখের কোণ জলে ঝাপ্‌সা হয়ে যায়।

পরের দিন সকালে এক সময় অমিতা শুধোয় স্বামীকে, সারারাত তুমি নাকি ঘুমোও না, লাইব্রেরী ঘরে পায়চারি করো?

কে বললে?

সে যে গতরাত্রে নিজের চোখেই ব্যাপারটা দেখেছে সে কথা না বলে অন্যভাবে একটু ঘুরিয়ে জবাব দেয় অমিতা। বলে, যে-ই বলুক—কথাটা সত্যি কি না আমি তাই জিজ্ঞাসা করছি।

প্রথমটা হিমাদ্রি কোন জবাবই দিতে চায় না কিন্তু শেষ পর্যন্ত অমিতার পীড়াপীড়িতে না বলেও পারে না। বলে, ঘুম হয় না—

ঘুম হয় না?

না।

কেন?

তা জানি না। ঘুম আসে না, ঘুমোতে আমি পারি না।

কথাটা বলতে বলতে হিমাদ্রি যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

ঘুম হয় না তো ডাক্তার দেখাও না কেন?

তুমি কি ভাব ডাক্তার আমাকে ঘুম পাড়াতে পারবে?

ডাক্তার ঘুমের ঔষধ দিলেই ঘুম আসবে। আজ আমি ডাঃ রায়কে খবর দেবো।

না, না—অমিতা তুমি জান না—

আয়নায় একবার নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখ তো! কি

চেহারা হয়েছে—শোন আজ থেকে আমি নীচে তোমার এই ঘরেই শোব।

না, না—অমিতা, না। রাত্রে আমার কাছে তোমরা কেউ এসো না।

আসবো না?

না, না—কেউ না কেউ না—কাউকে আমার দরকার নেই, কাউকে না।

কেমন যেন তীব্র হয়ে ওঠে হিমাদ্রির কণ্ঠস্বর।

অমিতা কিন্তু স্বামীর নিষেধ শুনলো না।

ডাঃ রায়কে সেদিনই ফোন করে দিল হিমাদ্রিকে এসে একটিবার দেখে পরীক্ষা করে যাবার জন্য।

প্রৌঢ় ডাঃ রায় এই পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত।

অমিতার ফোন পেয়ে পরদিনই সকালে এসে হাজির হলেন।

হিমাদ্রি তখন তার ঘরে বসে প্রভাতী চা পান করছিল। পাশেই একটা চেয়ারে বসে ছিল অমিতা।

ডাঃ রায় সোজা একেবারে এসে সেই ঘরে ঢুকলেন।

এ বাড়িতে তাঁর বরাবর অবারিতদ্বার।

অমিতা ও হিমাদ্রি দুজনকেই তিনি নাম ধরে ডাকেন।

হিমাদ্রিই প্রশ্ন করে, ডাঃ রায়, আপনি এ সময়? বাড়িতে কারো অসুখ নাকি অমিতা?

শেষের কথাটা হিমাদ্রি অমিতার মুখের দিকে তাকিয়েই বলে।

ডাঃ রায় মৃদু হেসে বলেন, কেন—তোমার জন্যই তো আমি এলাম।

আমার জন্য!

হ্যাঁ, অমিতা মা ফোন করেছিল। কি হয়েছে তোমার?

আমার আবার কি হবে! আপনি কি আমাকে কোয়াইট হেল্‌দি অ্যাণ্ড হার্টি দেখছেন না?

ওর কথা শুনবেন না ডাঃ রায়, ওকে একটু ভাল করে পরীক্ষা করে দেখুন। সারারাত্রি নাকি একদম ঘুম হয় না।

এবার হিমাদ্রি স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে, আমি পাগল নই বা অসুস্থও নই, সম্পূর্ণ সুস্থ।

কথাটা বলে আর অপেক্ষা করে না হিমাদ্রি, সহসা চেয়ারটা ঠেলে উঠে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

ডাঃ রায় সত্যিই যেন একটু কেমন বিব্রত বোধ করেন।

কি করবেন কি বলবেন বুঝতে পারেন না।

অসহায়ভাবে চেয়ে থাকেন অমিতার মুখের দিকে।

তারপর একসময় ধীরে ধীরে বলেন, ব্যাপার কি মা অমিতা? হিমাদ্রিকে যেন একটু বেশ চঞ্চল মনে হলো।

আমি তো সেই জন্যই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম ডাঃ রায়।

তাই তো মা, এখন তো মনে হচ্ছে ও আমার সঙ্গে কোন কথাই বলবে না। দেখি ভেবে। আচ্ছা, তোমাদের সাংসারিক এমন কোন কারণ কি ঘটেছে কিছু যাতে—

উনি তো সংসারের কোন ব্যাপারেই থাকেন না ডাঃ রায়, আপনি তো জানেনই।

তবে?

কি জানি।

চিন্তিত ডাঃ রায় সেদিনকার মত বিদায় নেন।

অমিতা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

অমিতা হিমাদ্রির ব্যাপারে সত্যিই যেন একটু চিন্তিত হয়ে ওঠে!

সেদিন বিকেলের দিকে ঘরে বসে অন্যমনস্কভাবে অমিতা হিমাদ্রির কথাই ভাবছিল।

হিমাদ্রির এ পরিবর্তনের কারণ কি!

এক সময় মনে হয় তার অবহেলা নয় তো!

কথাটা মনে হতেই অমিতা যেন মনের মধ্যে কেমন আচম্‌কা একটা ধাক্কা খায়।

সত্যিই তো।

নিষ্ঠুর অবহেলাই সে কি করেনি এই দীর্ঘ একুশটা বছর তার স্বামীকে।

স্ত্রীর কোন সম্পর্কই সে তো রাখে নি তার স্বামীর সঙ্গে।

শুধু অবহেলাই বা কেন, অমার্জনীয় ত্রুটি।

হিমাদ্রি তো মিথ্যা বলেনি, সত্যিই সে তাকে পর করে দিয়েছে।

কিন্তু কেমন করেই বা সে পারলো হিমাদ্রিকে এমনি করে পর করে দিতে!

তাছাড়া কেবল কি হিমাদ্রিরই, তারও কি স্ত্রী হিসাবে হিমাদ্রির প্রতি কর্তব্য নেই!

কিন্তু—

মা!

চম্‌কে ওঠে অমিতা প্রদীপের ডাকে।

ইতিমধ্যে কখন যে প্রদীপ এসে ঘরে ঢুকেছে অমিতা টেরও পায় নি।

কি হয়েছে মা, অমন করে বসে আছো?

কই বাবা, কিছু না তো। কিন্তু তুই আজ খেলতে যাসনি?

না মা, আজ যে আমাদের বাগানের লনেই খেলবো।

বাগানের লনে?

হ্যাঁ, তুমি জান না বুঝি, বাবা মালীদের দিয়ে বাগানের লন ঠিক করিয়ে দিয়েছেন।

তাই নাকি!

হ্যাঁ।

অমিতা বেশ একটু অবাকই হয়।

বাবা আমাকে সেদিন ডেকে বললেন, ক্লাবে কেন খেলাতে যাই, বাগানের লনেই তো খেলতে পারি। তারপরই তিনি চাকরদের ডেকে

লন ঠিক করতে বলে দিলেন। আজ থেকে এখানেই খেলা হবে, বন্ধুদের সব বলে দিয়েছি এখানে আসতে। আচ্ছা মা—

কি রে?

বাবা তো শুনেছি একসময় পর পর তিনবার টেনিসে চ্যাম্পিয়ানশিপ পেয়েছিলেন—

হ্যাঁ, টেনিস ওঁর খুব প্রিয় খেলা ছিল।

তা ছেড়ে দিলেন কেন? ওঁর বয়সী যাঁরা তাঁরা তো এখনো খেলেন দেখি।

তা তুই বললেই তো পারিস খেলতে।

কি যে তুমি বল মা। কেমন যেন একটু বিব্রত লজ্জিত ভাবেই কথাটা বলে প্রদীপ।

অমিতা বলে, কেন! বলতে দোষ কি!

না।

না কি রে।

নাঃ, বাবা কি ভাববেন।

কেন, ভাববেন আবার কি। বলিস না তুই।

প্রদীপ চুপ করে থাকে।

॥ দুই ॥

হিমাদ্রি নিজেও বুঝতে পারে, দিনের বেলার হিমাদ্রি আর রাত্রের হিমাদ্রির মধ্যে অনেক তফাত।

সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির দুটো মানুষ।

একেবারে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটো সত্তা।

দিনের আলোয় যে আত্ম-প্রতিষ্ঠ অকুতোভয়—রাত্রের অন্ধকারে সে-ই অসহায়, ভীরু, ভীত এক পলাতক জীব।

দিনের আলোয় যে বাদীপক্ষকে কূট যুক্তি আর তীক্ষ্ণ সওয়ালে

কোণঠাসা করে—রাত্রের অন্ধকারে সে-ই অসহায়, আত্মপক্ষ সমর্থনে বিব্রত, নিজেই যেন কোণঠাসা হয়ে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিকে তাকায়।

রাত্রি যতই গভীর হতে থাকে—একটা অদৃশ্য ভয়, একটা আতঙ্ক যেন চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরতে থাকে।

দুটো ছায়ামূর্তি তার দু'পাশে এসে দাঁড়ায়।

দিনের আলোয় প্রকাশ্য আদালতে দাঁড়ালে যে প্রথিতযশা আইনজ্ঞ হিমাদ্রি চৌধুরীর সামনে দাঁড়িয়ে বাদীপক্ষের বুকের ভিতর কাঁপুনি ধরে সেই হিমাদ্রিকেই যেন রাত্রে দাঁড়াতে হয় অপরাধী হয়ে আর এক কাঠগড়ায়।

অদৃশ্য এক সওয়ালকারীর সওয়ালের জবাব দিতে হয়।

আগে আগে সে সারাটা রাত ধরে প্রায় নীচের লাইব্রেরী ঘরে বা তদসংলগ্ন শয়নঘরের মধ্যে পায়চারি করতো—এখন পায়চারি করতে করতে কখনও বারান্দায় বা বাগানেও চলে যায় অন্যমনস্ক-ভাবে।

আপন মনে ভূতের মত পায়চারি করে, আর বিড় বিড় ক'রে বকে চলে।

প্রদীপ ব্যাপারটা কিছুই জানতো না।

অমিতাও কোন দিন বলেনি।

ফাইন্যাল ইয়ারের পরীক্ষা এসে গিয়েছে, অনেক রাত জেগে প্রদীপকে পড়াশোনা করতে হয়।

কয়দিন থেকে প্রচণ্ড গরম পড়েছে।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করে নীচের বাগানে একটু খোলা হাওয়ায় বেড়াবার জন্য নেমে এসে হঠাৎ প্রদীপ যেন থমকে দাঁড়িয়ে যায়।

মৃদু একটা কণ্ঠস্বর প্রদীপের কানে আসে, উমা আমি ভীরু, অমি দুর্বল। And I admit—I did injustice to you… !

বারান্দায় অস্পষ্ট আলো-আঁধারির মধ্যে দীর্ঘ একটা ছায়ামূর্তি।

কে, কে ওখানে ? প্রদীপ শুধোয়।

প্রত্যুত্তর আসে আলো-আঁধারি থেকে যেন :

A Daniel has come to judgement ! Yea,
a Daniel !
O wise young judge, how I do honour
thee !

বাবা ! প্রদীপ বিস্মিত কণ্ঠে ডাকে।

আপনই মনেই একা একা বিড় বিড় করে তখনো বলে চলেছে হিমাদ্রি :

An oath, an oath ! I have an oath
in heaven.

বাবা !

কে, কে ওখানে ?

বাবা, আমি প্রদীপ—

প্রদীপ ! the light—তবে, তবে—এত অন্ধকার কেন !

বাবা—।

A dungeon horrible, on all sides round,
As one great furnace flamed ;
yet from those flames
No light, but darkness visible—

না, না—উমা, উমা—শোন, শোন—

অন্ধের মত আপন মনে বিড় বিড় করতে করতে এগিয়ে যেতে গিয়ে বারান্দার বড় থামটার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলো হিমাদ্রি।

প্রদীপ তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। চীৎকার করে ডেকে ওঠে, বাবা, বাবা—

কে, কে ?

বাবা, আমি, আমি প্রদীপ।

খোকা, আমার খোকা ?

চলুন বাবা, ঘরে চলুন।

ঘরে যাবো?

হ্যাঁ বাবা, চলুন, ঘরে চলুন।

প্রদীপ হিমাদ্রিকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে আসে।

হাতে ধরে হিমাদ্রিকে চেয়ারটার উপর বসিয়ে দেয়, তারপর বলে মাকে ডেকে আনবো বাবা?

মা!

হ্যাঁ, মাকে ডেকে দিই—

না, না—don't disturb her. তারপরই একটু থেমে বলে, ও প্রদীপ তুমি—

আমাকে, কিছু বলছিলেন বাবা?

তোমাকে, কই না তো! আচ্ছা, thank you my boy, তুমি এবার শোওগে যাও। রাত জেগো না আর, যাও।

প্রদীপ মুহূর্তকাল যেন কি ভাবে তারপর ঘর থেকে বের হয়ে যাবার জন্য দরজার দিকে এগুতেই হিমাদ্রি ডাকে, শোন—

ঘুরে দাঁড়ায় প্রদীপ, কিছু বলছিলেন?

তোমার মা—

মাকে ডেকে দেবো?

না না,—ডাকতে হবে না। বলছিলাম—তুমি, তুমি তাকে দেখো। She is very lonely—alone—বড় একা। তাকে তুমি দেখো।

হিমাদ্রির কথাটা ঠিক যেন হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না প্রদীপ।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তাকে দেখো, কিছুই তো সে পায়নি, পেয়েও কিছু নেয়নি সে। আচ্ছা, আচ্ছা—তুমি যাও।

প্রদীপ ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

হিমাদ্রি আপন মনেই বিড় বিড় করে বলতে থাকে, একজনকে দিলাম না, কিছুই দিলাম না—আর যাকে দিতে চাইলাম সে নিল না। কিছুই নিল না, কিছুই না—

॥ তিন ॥

নতুন এক খেয়াল হয়েছে কয়দিন থেকে হিমাদ্রির।

আদালত থেকে ফিরে সন্ধ্যা হলেই, আদালতের পোশাক ছেড়ে সাধারণ বেশভূষায় পদব্রজে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়ে। তারপর উদ্‌ভ্রান্তের মত রাত নটা দশটা—কখনো রাত এগারটা পর্যন্ত গরীব-দুঃখীদের পাড়ায় পাড়ায়, যত অন্ধকার ঘিঞ্জি নোংরা বস্তির মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, এখানে কেউ খুব দুঃখী একজন স্ত্রীলোক আছে? সঙ্গে তার একটি ছেলে বা মেয়ে?

কেউ জবাব দেয়, কেউ দেয় না, পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

কেউ টিপ্পনী কাটে, কেউ চোখ টিপে অর্থপূর্ণ হাসি হাসে।

কেউ হয়ত দুষ্টপ্রকৃতির লোক বলে, কি রকম দেখতে বলুন তো সেই মেয়েছেলেটা? কত বয়স?

দেখতে! দেখতে বেশ সুন্দর। বয়স—বয়স কত হবে, বছর ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ—

না। ঐ বয়সের তো কেউ নেই। তবে অল্পবয়সের দু'চারজন আছে। তা দেখতে সুন্দরই—

কেউ কেউ হয়ত আবার কোন ঘরে নিয়ে যায়।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ডাকে, ওরে গোলাপী, দেখ রে, কে এক বাবু তোকে ডাকছে—

ঝি-শ্রেণীর কোন মেয়েমানুষ হয়ত বের হয়ে আসে।

কে গা?

হিমাদ্রি চেয়ে চেয়ে দেখে তার মুখের দিকে।

কই এ তো উমা নয়।

হিমাদ্রি আবার পা বাড়ায়।

সেদিন এক প্রৌঢ়া এক বস্তির মধ্যে ওকে ঘুরতে দেখে শুধোয়, কাকে খুঁজছো গা বাবু?

আচ্ছা উমা, উমা নামে একটি বউ তোমাদের এই বস্তিতে কেউ থাকে?

না বাবু, ও নামে কেউ এখানে আছে বলে তো জানি না—শুনিনি!

শোননি, শোননি তার নাম। তার নাম, তার নাম উমা।

না, তেমন নামে কেউ—

দেখতে বেশ সুন্দর, রোগা, কপালের বাঁদিকে একটা কাটা দাগ আছে।

না—

তার, তার একটি ছেলে বা মেয়ে আছে।

কই না, দেখিনি তো।

তবে কোথায় গেল। আপন মনেই আবার বলে হিমাদ্রি।

ঐ সময় প্রৌঢ়া বলে, তা খোঁজ করে দেখলে—

পারবে? খোঁজ করে আমাকে খবরটা দিতে পার? অনেক, অনেক টাকা তোমাকে দেবো আমি। যা চাও তাই দেবো।

কিন্তু যার খোঁজে হিমাদ্রি ঘোরে তার খোঁজ কোথাও পায় না।

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে একসময় গৃহে ফিরে আসে।

মনে হয়, কি আর হবে খুঁজে, উমা হয়ত কবে গঙ্গার জলে ডুবে আত্মহত্যা করছে।

কিম্বা হয়ত কলকাতাতেই নেই।

দুঃখের স্রোতে শ্যাওলার মত ভাসতে ভাসতে হয়ত অন্য কোন দেশে, অন্য কোন জায়গায় গিয়ে পড়েছে।

সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় তারপর সারাটা রাত জেগে পায়চারি করে।

হিমাদ্রিকে আর চেনাই যায় না যেন।

মুখটা ভেঙে গিয়েছে, তু'পাশে গলার কণ্ঠা বের হয়ে পড়েছে।

অমিতা কেঁদে ফেলে, কি হয়েছে তোমার বল তো!

কেন, কি হয়েছে! দেখো অমিতা, একটা কথা ভাবছিলাম কদিন থেকে।

কি?

কিছুদিনের জন্য আমি বাইরে যাবো।

বেশ তো, যাও না। কিছুদিন বাইরে কোথাও চেঞ্জেই না হয় ঘুরে এসো।

হিমাদ্রি স্ত্রীর কথার কোন জবাব দেয় না।

অন্যমনস্কভাবে খোলা জানালাপথে তাকিয়ে থাকে বাইরের আকাশের দিকে।

বহুদূরে নজরে পড়ে একটা চিল পাখা মেলে শূন্যে ভাসছে!

সামনেই টেবিলের 'পরে ঐদিনকার সংবাদপত্রটা পড়ে আছে।

হঠাৎ অমিতার নজরে পড়লো প্রদীপের ছবিটার দিকে, তার ফাইন্যাল এম, বি, পরীক্ষার অভূতপূর্ব সাফল্যের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে ঐ দিনকার সংবাদপত্রে।

ইউনিভারসিটিতে রেকর্ড মার্ক পেয়ে চার চারটে স্বর্ণপদক লাভ করেছে প্রদীপ চৌধুরী।

সংবাদটা অবিশ্যি অমিতা বাংলা সংবাদপত্রে ঐ দিন সকালেই দেখেছিল।

কিন্তু হিমাদ্রির টেবিলের 'পরে ঐ দিনকার ইংরেজী সংবাদপত্রটা পড়ে ছিল।

অমিতার বিশেষ দৃষ্টি যেটা আকর্ষণ করে সেটা ঐ সংবাদটা নয়।

সংবাদটার চারপাশে মোটা কারে লাল পেনসিল দিয়ে দাগ কাটা!

লাল পেনসিলের সেই দাগটাই তার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে যেন বিশেষ করে।

হঠাৎ একসময় পার্শ্বে দণ্ডায়মান স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকিয়ে মৃদু স্মিতকণ্ঠে হিমাদ্রি বলে, দেখেছো অমিতা, তোমার ছেলে ফাইন্যাল এম, বি-তে এবার ব্রিলিয়াণ্ট্ রেজাল্ট্ করেছে। এই দেখো— বলতে বলতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত লাল পেন্‌সিলে দাগ দেওয়া সংবাদটার দিকে আঙ্গুল তুলে দেখায়।

অমিতা চুপ করে থাকে।

He is a jewel। ওকে তুমি বিলেত পাঠাও অমিতা।

হিমাদ্রি যে ইদানীং কিছুদিন ধরে প্রদীপের সঙ্গে কথা বলে, তার প্রতি হিমাদ্রির দৃষ্টি পড়েছে—সেটা অজানা ছিল না অমিতার।

অমিতা চুপ করে থাকে।

টাকা তোমার আছে জানি অমিতা তবে একটা কথা—যদি কিছু না মনে কর তো—বলি। মৃদুকণ্ঠে এক সময় বলে হিমাদ্রি।

এতক্ষণে কথা বলে অমিতা।

মৃদুকণ্ঠে বলে, কি?

তোমার ছেলের বিলেতের খরচটা যদি আমি দিই নেবে?

হিমাদ্রির কণ্ঠস্বরে এমন একটা বিষণ্ন করুণ কাকুতি ফুটে ওঠে যে সহসা কোন জবাব দিতে যেন পারে না অমিতা।

কোন জবাবই তার ওষ্ঠপ্রান্তে যেন যোগায় না।

শুধু তাই নয়, আরও একটা সংশয়ের পীড়া যা তার বুকের নিভৃতে দীর্ঘ কয় বৎসর ধরে তাকে ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত করেছে অথচ মুখ ফুটে প্রথমটায় তার স্বামীর কাছে প্রকাশের পথ পায়নি, কেবল মাত্র স্বামীর প্রতি একটা অন্ধ অভিমানেই অনেকদিন তারপর বুঝি প্রকাশ পায় নি, দুর্নিবার ও অবশ্যম্ভাবী একটা লজ্জার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য এবং স্বামীকেও তার বাঁচাবার জন্য সেই কথাটাই যেন আজ অকস্মাৎ আবার তার গলার কাছে এসে ঠেলাঠেলি করতে থাকে।

একবার মনে হয় সবকিছুর মীমাংসা আজ এই মুহূর্তেই হয়ে যাক, দু'জনার কাছ থেকে মুক্তি পাক দু'জনা।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হয় তার মত হাস্যকর বুঝি সত্যিই আজ আর কিছু হতে পারে না।

কারণ একুশ বছর আগেকার সে অমিতাও আজ আর নেই, আজকের হিমাদ্রিও সেই হিমাদ্রি নয়।

অনেক দিন অনেক রাত্রি—অনেক মাস ও বছর পার হয়ে গিয়েছে দুজনের জীবনে আজ।

কি হবে আজ আর সেই-জীবনের হারিয়ে যাওয়া কোন এক পৃষ্ঠাকে নতুন করে চোখের সামনে মেলে ধরে?

যা অতীত হয়ে গিয়েছে তাকে আজ আবার বর্তমানের মধ্যে টেনে এনে কার কতটুকু কি লাভ হবে!

ক্ষতি যা হবার তা তো দু'জনারই হয়ে গিয়েছে।

সে ক্ষতির পূরণ তো আজ আর কোনমতেই সম্ভব নয়।

তবে কি হবে আজ আর মিথ্যে বিড়ম্বনাকে টেনে এনে!

তার চাইতে এই ভাল।

অমিতা!

স্বামী আবার ডাকতেই যেন চম্‌কে ওঠে অমিতা।

তাকায় স্বামীর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

কই, কিছু বললে না তো?

কি বলব?

যা জিজ্ঞাসা করলাম।

বেশ তো, ও যদি বিলেত যায়, টাকার যদি প্রয়োজন হয়—নেবে তোমার কাছ থেকে।

স্ত্রীর জবাবে মৃদু হাসলো হিমাদ্রি, কোন কথাই আর বললো না।

হঠাৎ দিন-তিনেক পরে সন্ধ্যাবেলা অমিতা আর প্রদীপ একদিন গাড়িতে চেপে গেট দিয়ে ঢুকতে গিয়ে, গেটের গায়ে লাগানো একটা নতুন নেম-প্লেট দেখতে পেলো।

কালো কষ্টিপাথরে সোনালী জলে লেখা সুন্দর একটি নেম-প্লেট।

ডাঃ প্রদীপ চৌধুরী, এম্‌. বি.

মা আর ছেলে দু'জনেই সবিস্ময়ে এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকায়।

কে লাগালো নেম-প্লেটটা ?

দু'জনাই অবশ্য ব্যাপারটা মনে মনে বুঝতে পারে, তবু প্রদীপ দরোয়ানকে ডেকে প্রশ্ন করতেই জানতে পারে, নেম-প্লেটটা সাহেবই লাগিয়েছেন, ঐ দিনই বিকেলের দিকে লোক আনিয়ে, মাঈজী ও দাদাবাবু বেড়াতে বেরুবার পর।

প্রদীপ আর বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য করলো না।

কিন্তু সেই দিনেই সন্ধ্যারাত্রির পর আর একটা ব্যাপার আবিষ্কৃত হলো।

হিমাদ্রি বাড়িতে নেই।

তার লাইব্রেরী ঘরে টেবিলের উপর অমিতার নামে একটা চিঠি পাওয়া গেল।

সংক্ষিপ্ত দু'লাইনের চিঠি।

কিছুদিনের জন্য সে বাইরে যাচ্ছে। খরচের টাকা-পয়সার যা প্রয়োজন লোহার সিন্দুক থেকেই তো সে নিতে পারে, ব্যাঙ্কেও ইনস্ট্রাকশন দেওয়া রইল, ব্যাঙ্কও দেবে।

আর কোন কথাই নেই চিঠিতে।

কোথায় যাচ্ছে, কবে আসছে কিছুই না।

অমিতাও কোন উচ্চবাচ্য করলো না, একেবারে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল।

॥ চার ॥

চৌধুরীবাড়ির গেটে নতুন নেম-প্লেটটি : ডাঃ প্রদীপ চৌধুরী, এম. বি. আর একজনেরও নজরে পড়েছিল,—যে বলতে গেলে প্রায় গত একুশ বছর ধরে নিয়মিত প্রাতে ঝড় জল বৃষ্টি দুর্যোগ সব কিছু

উপেক্ষা করে ঐ পথ ধরে যাতায়াত করেছে এবং যাতায়াতের পথে অবগুণ্ঠনের তলা থেকে তৃষিত ব্যাকুল দৃষ্টিতে ঐ বাড়িটা দেখে গিয়েছে।

ঐ বাড়িটার প্রতিটি ইটের গাঁথনির ইট, লোহার গেটের ওদিকে ভিতরের চওড়া সুরকি-ঢালা রাস্তাটা, বাড়ির জানালা-দরজার রঙ, পর্দার রঙ—সব, সব কিছুই যে তার পরিচিত।

শুধু কি পরিচিত!

তার মনের মধ্যে যে পাথরের বুকে দাগ কাটার মত কেটে কেটে বসে গিয়েছে।

জীবনে কোন দিন ঐ বাড়িটার মধ্যে পা ফেলবার অধিকার না পেলেও তার মন যে সর্বক্ষণ এই একুশ বছর ধরে ঐ গৃহেরই সর্বত্র কেঁদে কেঁদে ফিরেছে।

ঐ বাড়িকে কেন্দ্র করেই তার যত দুর্ভাবনা।

ঐ বাড়িকে কেন্দ্র করেই যে ভগবানের কাছে তার যত সজল প্রার্থনা।

সেই পরিচয়ের মধ্যে নতুন কালো পাথরে সোনালী জলে লেখা ডাঃ প্রদীপ চৌধুরী নামটা প্রথম যেদিন তার নজরে পড়লো থমকে দাঁড়ালো সে।

ডাঃ প্রদীপ চৌধুরী, এম. বি.

দেহের প্রতি রক্তকণিকার সঙ্গে যে জড়িয়ে আছে ঐ নামটা।

দশ মাস দশ দিনের কত ব্যথা-বেদনার স্মৃতি।

ভালবাসা অপমান আর লজ্জার ইতিহাস।

বুভুক্ষিত এক জননীর অশ্রুজলের সঙ্গে, কামনার সঙ্গে যে জড়িয়ে আছে ঐ নামটা।

দেখে দেখে যেন আর আশা মেটে না উমার।

তুচ্ছ একটা নাম তো নয় ও, ও যে উমার প্রতিটি বুকের পাঁজর।

খোকন, তার কত সাধের খোকন!

কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে, দুঃখের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে যে খোকনকে তার কর্ণজননী কুন্তীর মতই একদিন বুক থেকে

ছিঁড়ে ঐ লোহার গেটটার সামনেই কোন এক রাত্রি-শেষে তাকে ফেলে রেখে যেতে হয়েছিল।

ভুলতে কি পেরেছে উমা আজও সেই দিনটির কথা।

কত আশঙ্কা কত ভয়ই না নিয়ে খোকনকে তার বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে এক রাত্রি-শেষে দাঁড়িয়েছিল এসে সে ঐ গেটটারই সামনে।

সে কি দুশ্চিন্তা!

যদি অমিতা তার সন্তানকে গ্রহণ না করে!

পথের আবর্জনা বলে পথেই ফেলে দেয়!

কি হবে তবে তার ছেলের!

কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ।

সহস্র কোটি ধন্যবাদ, অমিতা তার খোকনকে পরম সমাদরে বুকে তুলে নিয়েছে।

শুধু বুকে তুলেই নয়, দিয়েছে তারই পুত্র-পরিচয়।

তার খোকন আজ আর অজ্ঞাতকুলশীল নয়।

দু'চোখের দৃষ্টি অশ্রুতে ঝাপ্‌সা হয়ে যায় উমার।

বেলা হয়ে গিয়েছে, মানুষজন হাঁটতে শুরু করেছে রাস্তায়, আর বেশীক্ষণ এখানে দাঁড়ানো সমীচীন হবে না।

উমা ফিরে গেল সেদিনকার মত।

পরের দিন কিন্তু আরও ভোরে উঠে গেল গঙ্গাস্নান করতে।

রাত্রির শেষের আব্‌ছা অন্ধকারে তখনো চারিদিক অস্পষ্ট।

সোজা এসে গেটটার সামনে দাঁড়ালো।

ঝক্‌ ঝক্‌ করছে নতুন নেম-প্লেটটা।

ডাঃ প্রদীপ চৌধুরী, এম. বি.

একবার ভয়ে ভয়ে শঙ্কিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাল। না, কেউ নেই আশে-পাশে।

তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল।

আঁচল দিয়ে সযত্নে গভীর স্নেহে নেম-প্লেটটা বার বার মুছে দিল উমা।

মনে মনে সেই অদৃশ্য দেবতার চরণে প্রার্থনা জানাল, ভগবান, খোকনকে আমার রাজা কর। বড় কর, অনেক বড় কর। অনেক বড়।

সেই দিন থেকেই নতুন যেন একটা কাজ হয় উমার।

গঙ্গাস্নানে যাওয়ার পথে নেম-প্লেটটাকে পরম স্নেহে বার বার আঁচল দিয়ে মুছে দিয়ে যাওয়া।

উমা স্বপ্ন দেখে।

স্বপ্ন দেখে তার ছেলে প্রদীপ ডাক্তার, যেন মস্তবড় ডাক্তার হয়েছে।

চারিদিকে তার যশ।

দু'হাত তুলে রোগীরা তাকে আশীর্বাদ জানায়।

দূর থেকে উমা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

তার যশ আর কীর্তির কথা গানের সুরের মত অহরহ তার কানে ভেসে আসে।

প্রদীপ ডাক্তার।

মস্তবড় ডাক্তার।

সেদিন গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে গিয়ে দেখে, একজন প্রৌঢ়া বিধবা তার একমাত্র আট-দশ বছরের মা-মরা অসুস্থ নাতিটিকে নিয়ে এসে গঙ্গার ঘাটে যে সন্ন্যাসী ধুনী জ্বেলে বসে থাকে তার কাছে নাতির রোগমুক্তির জন্য আশীর্বাদ চাইছে।

দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখে উমা আর মনে মনে কি যেন ভাবে।

একসময় ভদ্রমহিলাকে ডাকে উমা, শুনুন!

আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ। ঐটি কে সঙ্গে?

নাতি, একমাত্র নাতি মা!

কি হয়েছে ওর ?

হাসপাতালে এক বছর ধরে চিকিৎসা করাচ্ছি মা, বলে নাকি কী সব পেটের গোলমাল।

তা, সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছিলেন কেন ?

চিকিৎসা করিয়েও তো কিছু হলো না, তাই সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে আশীর্বাদ চাইছিলাম।

ওতে কি হবে, বরং একজন ভাল ডাক্তার দেখান।

ভাল ডাক্তার !

হ্যাঁ, ছেলেমানুষ হলে কি হবে, নাম তার তো কেউ বড় একটা এখনো জানে না—কিন্তু চিকিৎসায় সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী—

কোথায় মা, কোথায় সে ডাক্তার ?

প্রদীপের নাম-ঠিকানা বলে দেয় উমা।

যান তার কাছে, গায়ে হাত দিলেই সব রোগ সেরে যাবে।

তুমি বুঝি চেন তাকে মা ? তোমার কেউ হয় বুঝি ?

না না, আমার তো কেউ নয়। চিনি—না চিনিও না, তবে নাম শুনেছি তো।

এমনি করে গঙ্গার ঘাটে জনে-জনে এক ধন্বন্তরী চিকিৎসকের খোঁজ দেয় উমা।

রোগীরা খুঁজে-পেতে গিয়ে প্রদীপের কাছে হাজির হয়।

ছেলেমানুষ হলে কি হবে, রাজপুত্রের মত প্রদীপের চেহারাটাই সকলকে আকর্ষণ করে।

কেউ নিয়ে যায় ছেলে, কেউ মেয়ে, কেউ নিজের জন্যই যায়। প্রদীপ তো অবাক।

প্রদীপ শুধোয়, কে বললে আপনাকে আমার কথা ?

তারা বলে, গঙ্গার ঘাটে একজন সন্ন্যাসিনী বলেছেন।

প্রদীপ অবাক হলেও সাধ্যমত তাদের চিকিৎসা করে, কাউকে কাউকে আবার হাসপাতালেও নিয়ে যায়।

তার চেষ্টা ও যত্নে অনেকেই ভাল হয়।

প্রদীপ একদিন শেষ পর্যন্ত কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই গঙ্গার ঘাটে গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু তাকে দেখতে পায় না। কারণ প্রদীপকে দেখেই উমা অলক্ষ্যে গা-ঢাকা দিয়ে সরে গিয়েছিল।

মাকেও একদিন কথাটা বলে প্রদীপ।

বলে, কে বল তো মা?

কি জানি বাবা।

সত্যিই আশ্চর্য, তাই না?

অমিতা বিশেষ কিছু বলে না, কারণ সে নিজেও কম আশ্চর্য হয় না।

॥ পাঁচ ॥

এদিকে সেই যে হিমাদ্রি অমিতাকে একটা চিঠি লিখে রেখে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে, সাত মাস হলো তার আর কোন সন্ধানই নেই।

কথাটা কাউকে বলতেও পারে না অমিতা, বলবারও তো নয়।

অহর্নিশি নিজের মনের মধ্যে নিজেই জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়।

আজ কেন যেন বার বার মনে হয় অমিতার—স্বামীর ঐভাবে গৃহত্যাগের মূলে সেই-ই!

সেই বোধহয় স্বামীকে তার গৃহত্যাগী করলো।

আজ মনে হয় প্রদীপের ব্যাপারটা ঐ চিঠি ও আংটি ছাড়া এবং হিমাদ্রির দাদুর সেই চিঠিটা ছাড়া বাকীটা সবই তো তার কল্পনা বই আর কিছু নয়।

সেই কল্পনা তার মিথ্যাও তো হতে পারে, তার মধ্যে এক বিন্দু সত্য তো না-ও থাকতে পারে।

কারণ কোন দিনই তো সে স্বামীর সঙ্গে মুখোমুখি কোন মীমাংসা

করবার চেষ্টামাত্রও করেনি, যা সে অনায়াসেই পারতো।

অন্ধ অভিমানে দিনের পর দিন বছরের পর বছর মুখ বুজে না থেকে সোজাসুজি স্পষ্টাস্পষ্টি সব কথা স্বামীকে তার সে জিজ্ঞাসাও তো করতে পারতো।

তাও তো সে করেনি।

তবে কেমন করে সব কিছু সে অবিসংবাদী সত্য বলেই বা মেনে নিল!

কোথায় চলে যায় এত বছরের তীব্র অভিমান অমিতার। অনুশোচনায় বুক ভরে ওঠে তার।

অন্যায় করেছে সে, সত্যিই অন্যায় করেছে।

নিষ্ঠুর আচরণ করেছে সে তার স্বামীর প্রতি।

আজ মনে হয় কি করে সে এমনি বছরের পর বছর অন্ধ অভিমানে স্বামীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রইলো।

অমিতার আহার গেল, নিদ্রা গেল, মনের সমস্ত শান্তি গেল।

এবং যত দিন যেতে থাকে, হিমাদ্রি ফিরে আসে না—ততই যেন অমিতার মনের মধ্যে অনুশোচনা তীব্র হতে তীব্রতর হয়।

ঘরের জানালা-পথে তৃষিত নয়নে চেয়ে থাকে অমিতা একটি পরিচিত মুখ দেখবার আশায়।

কান পেতে থাকে একটি পরিচিত পদশব্দ শোনবার আশায়।

চিন্তায় চিন্তায় কতখানি যে দুর্বল হয়ে যায়, অমিতা নিজেও বুঝি তা বুঝতে পারে না।

হঠাৎ একদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠবার সময়।

মাথা ঘুরে পড়ে যেতেই দাসদাসীরা ছুটে আসে।

প্রদীপ বাড়িতে ছিল না।

তাকে ফোনে সংবাদ দেওয়া হয়, তাড়াতাড়ি সে ছুটে আসে।

অমিতা তখনও অজ্ঞান।

কলেজের একজন অধ্যাপককে প্রদীপ ফোনে ডেকে আনে।

তিনি পরীক্ষা করে ও সমস্ত ইতিহাস শুনে বলেন, সম্ভবতঃ মানসিক দুশ্চিন্তা ও নিউট্রিসনের অভাবে প্রেসার অত্যন্ত লো এবং হার্ট অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে।

কি হবে স্যার ?

বিশ্রাম ও চিকিৎসার দরকার।

অমিতার জ্ঞান ফিরে আসতেই প্রদীপ দু'হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে, তুমি এত অসুস্থ এ কথাটা এতদিন তুমি আমাকে জানতে দাওনি কেন মা ?

মৃদু ম্লান বিষণ্ণ হাসি হেসে ছেলের গালে হাত বুলোতে বুলোতে অমিতা বলে, তাহলে কি করতিস রে ?

চিকিৎসা করতাম আগে থেকেই।

মা কি কারও চিরকাল বেঁচে থাকে রে পাগল !

হ্যাঁ, বাঁচে, প্রদীপের মা বাঁচে—

তুই বড় হয়েছিস, মানুষ হয়েছিস, আমার কাজ তো ফুরিয়েছে রে। এবার তো আমার যাবারই সময়—

প্রদীপের দু'চোখের কোল ঝাপ্‌সা হয়ে যায়।

বলে, চলে যাবো মা, আমিও কিন্তু তাহলে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাবো !

আচ্ছা, আচ্ছা—হয়েছে। যা এবার বাইরে গিয়ে একটু ঘুরে আয় তো।

বল আগে আর ওসব কথা কখনো বলবে না তুমি।

না, না—বলবো না।

সত্যি ?

সত্যি।

প্রদীপ সেই দিনই কয়েকখানি সংবাদপত্রে তার মার অসুখের সংবাদ ছেপে দিয়ে বাবাকে গৃহে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ জানায়।

কয়েকদিন পরে রুগ্ন অমিতার শয্যার পাশে বসে প্রদীপ নানা গল্প করছিল।

হঠাৎ অমিতা একসময় বলে, হ্যাঁরে প্রদীপ, তুই যে বলেছিলি সেই মেয়েটিকে একদিন আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসবি, কই আনলি না তো!

কে, কার কথা বলছো মা?

কেন, সেই যে বলেছিলি তোদের কলেজেই পড়ে মেয়েটি।

ও গৌরী!

গৌরী বুঝি তার নাম?

হ্যাঁ।

তা, নিয়ে আয় না তাকে একদিন।

আসবে না মা।

কেন রে?

আমি যে তাদের বাড়িতে যাই না।

তা যাস না কেন, গেলেই তো পারিস।

সময় পাই কই!

ওঃ ছেলের আমার কি কাজ! গৌরীকে একদিন নিয়ে আয়, বুঝলি!

বেশ।

॥ ছয় ॥

ঠিক এমনি সময় আবার একদিন সন্ধ্যায় ফিরে এলো অচিন্ত্য।

প্রদীপ ঐ সময়টা বাড়িতে ছিল না।

অমিতা তখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারেনি। এবং ডাক্তারের নির্দেশে ও প্রদীপের কঠোর শাসনে বেশীর ভাগ সময়ই তার ঘরে শুয়ে-বসেই কাটে।

একটা আরাম কেদারার 'পর বসে কি একটা বই পড়ছিল অমিতা।

ঘরের মধ্যে তখনো আলো জ্বালেনি অমিতা।

ভৃত্য এসে ঘরে ঢুকল, মা।

কি রে ভোলা!

একজন সাহেব তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

সাহেব।

হ্যাঁ মা।

আমার সঙ্গে দেখা করবে কি! হয়ত খোকার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

না মা, তোমার কথাই বললে।

আমার কথা!

হ্যাঁ।

অমিতা মুহূর্ত-কাল যেন কি ভাবল। তারপর বলল, যা এখানেই নিয়ে আয়।

একটু পরেই ফিট্‌ফাট্ সাহেবী পোশাক পরিহিত অচিন্ত্য এসে ঘরে ঢুকল।

বৌদি!

কে! চমকে ওঠে অমিতা।

চিনতে পারচো না।

অচিন্ত্য!

হ্যাঁ।

অমিতার বুকের ভিতরটা দুর-দুর করে ওঠে একটা অজ্ঞাত ভয়ে যেন।

কেমন আছো, বৌদি?

তুমি? তুমি আবার কেন এসেচো, অচিন্ত্য?

ঋণ শোধ করতে।

ঋণ?

হ্যাঁ।

কিসের ঋণ?

বাঃ, মনে নেই একদিন তুমি আমাকে অনেক টাকা দিয়েছিলে ? সেই টাকাটাই ফিরিয়ে দিতে এসেছি।

অমিতা যেন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না।

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে।

ইতিমধ্যে অচিন্ত্যই ঘরের আলোটা জ্বেলে দিয়েছিল।

তুমি ভাবছো বোধ হয় বৌদি, অচিন্ত্যর মত লোক কি এ সব বলছে—তাই না ?

অমিতা চুপ।

তা ভাববারই কথা। কিন্তু যাক সে কথা। যা বলতে এসেছিলাম, সত্যিই তুমি আমাকে বাঁচিয়েছো বৌদি।

বাঁচিয়েছি!

হ্যাঁ। কি জান বৌদি, জুয়ো খেলে জীবনে একদিন অনেক খুইয়েছিলাম এবং ভেবেছিলাম আর বুঝি কিছুই ফিরে পাবো না। কিন্তু তোমার দেওয়া শেষবারের মত সেই টাকা আবার আমায় সব ফিরিয়ে দিয়েছে।

অচিন্ত্য!

হ্যাঁ, বৌদি। সব ফিরে পেয়ে তোমার টাকার ঋণটাই শুধু আমি আজ শোধ করতে এসেছি, তোমার আসল ঋণ নয়। বলতে বলতে পকেট থেকে এক বাণ্ডিল নোট বের করে অমিতার সামনে রাখল অচিন্ত্য।

আর এই চিঠিটাও রাখো।

বলতে বলতে একটা সযত্নে ভাঁজ-করা চিঠি এগিয়ে দিল অচিন্ত্য ওর হাতে।

চিঠি, কিসের চিঠি ?

প্রদীপকে যেদিন গেটের কাছে কুড়িয়ে পাই—তার সঙ্গে যে চিঠিটা ছিল সেই চিঠিটা।

কিন্তু—

যেটা তোমার কাছে আছে সেটা আসল নয়। এটাই আসল—

অচিন্ত্য—

এতদিন আমার কাছে ছিল আজ ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম।

অমিতা যেন বোবা। কোন কথাই মুখ দিয়ে তার বের হয় না।

কিন্তু আর নয়, আমি চলি। বলতে বলতে হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে অচিন্ত্য অমিতার পদধূলি নেয়।

একি! একি অচিন্ত্য!

কিছু না। আচ্ছা, চলি।

অচিন্ত্য যেমন এসেছিল তেমনি ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সত্যি, সেই যে প্রদীপ কথা দিয়ে এসেছিল একদিন যাবে বলে, সে-একদিন ও সে-ই যাওয়া গৌরীদের বাড়িতে প্রদীপের আজও ঘটে ওঠেনি।

মাঝখানে একটা বছর কেটে গিয়েছে ইতিমধ্যে।

কলেজে এবং হাসপাতালে অবিশ্যি দু'জনার তারপর বহুবার দেখা হয়েছে, আজও দেখা হয়, ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়েছে কিন্তু গৌরীদের বাড়িতে যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি প্রদীপের।

প্রথম প্রথম ভেবেছে আজ যাবো, কাল যাবো কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেক দিন কেটে যাওয়ার লজ্জায় আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

গৌরীও কেন যেন যাবার কথা বলেনি।

ইদানীং অবিশ্যি পাশ করার পর কাজের চাপও বেড়েছে, তা ছাড়া বিলেত যাবে তারই তোড়জোড়ে ব্যস্ত ছিল প্রদীপ কিছুদিন, কিন্তু সহসা ঐ সময় হিমাদ্রি বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ায় বিলেত যাওয়ার ব্যাপারটাই চাপা পড়ে গিয়েছিল।

মারও শরীর খারাপ। প্রদীপ হাসপাতাল ও প্র্যাক্‌টিসের পরে যেটুকু সময় পেত মার কাছে কাছেই থাকতো।

গৌরীর সঙ্গে প্রায় মাস-চারেক দেখা হয়নি।

মার কথায় গৌরীর কথা মনে পড়ে যায় প্রদীপের।

একবার ভাবে প্রদীপ, গৌরীদের বাড়ি যাবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিসের একটা সংকোচ যেন তার গতি রোধ করে।

তবু কয়দিন থেকে প্রদীপ গৌরীর কথাই ভাবছিল।

চেম্বার থেকে বের হয়ে সেদিন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে রেড রোড ধরে মন্থর গতিতে গাড়ি চালাতে চালাতে একসময় মেমোরিয়ালের কাছাকাছি ময়দানের ধার ঘেঁষে গাড়ি পার্ক করল প্রদীপ।

অন্যমনস্কভাবে গাড়ির মধ্যস্থিত রেডিয়োর সুইচটা 'অন' করে দিতেই বেতার ঘোষণাটা সচকিত করে তোলে তাকে।

'আকাশবাণী কলকাতা। এবারে আপনাদের আধুনিক গান গেয়ে শোনাচ্ছেন শ্রীমতী গৌরী চট্টোপাধ্যায়।'

গৌরী!

গৌরীর গান শুনতে শুনতে নতুন করে যেন মনে পড়ে যায় প্রদীপের, সত্যিই অনেকদিন গৌরীর সঙ্গে তার দেখা হয়নি।

গান শেষ হওয়ার আগেই গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘোরালো রেডিও স্টেশনের দিকে প্রদীপ।

গান শেষ হলো রেডিও স্টেশনের সামনে গাড়ি এসে থামতেই।

রেডিও স্টেশনের মেইন গেটের একপাশে রাস্তার উপরে একটা বিরাট সাদা রঙের কনভারটিব্‌ল প্লিমাউথ গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। তারই পিছনে নিজের গাড়িটা পার্ক করে অপেক্ষা করতে লাগলো প্রদীপ।

গান শেষ হয়ে গিয়েছে, এক্ষুণি বের হবে গৌরী রেডিও স্টেশন থেকে।

চমকে দেবে গৌরীকে প্রদীপ।

প্রায় মিনিট পনেরো অপেক্ষা করবার পর প্রদীপ দেখতে পেল, গৌরী রেডিও স্টেশন থেকে বের হয়ে আসছে।

কিন্তু—কিন্তু তার সঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে আসছে, সুটপরিহিত, মুখে সিগ্রেট—বিমান রায় না!

হ্যাঁ, তাদের কলেজের বিমান রায়ই তো।

প্রদীপদের একবছরের সিনিয়ার ছিল, এখনো পাশ করতে পারেনি।

বিরাট ধনী কোল-মার্চেন্ট রায়বাহাদুর বিজন রায়ের একমাত্র ছেলে বিমান রায়।

বিমান রায় কলেজে চিহ্নিত ছেলে।

ধনীর সন্তান হওয়ার জন্য এ বয়সে যতগুলো চারিত্রিক দোষ থাকা যেতে পারে সবগুলোই আছে বিমান রায়ের।

ফ্লাশ খেলে, রেস খেলে, বারে গিয়ে ড্রিংক করে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে, আর হৈ চৈ করে নানাবিধ ফাংসনের কর্ত্তামি করে।

আশ্চর্য! বিমান রায়ের সঙ্গে গৌরীর মত মেয়ের আলাপ হলো কি করে?

এতক্ষণে বুঝতে পারে প্রদীপ, সামনের দামী গাড়িটা বিমান রায়েরই গাড়ি।

প্রদীপ আর কোন সাড়া দেয় না।

বিমান গৌরীকে নিয়ে এসে তার গাড়িতে উঠে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বের হয়ে যায়।

রাত প্রায় সোয়া আটটা।

এত রাত্রে বিমানের সঙ্গে গৌরী কোথায় গেল!

॥ সাত ॥

গাড়িতে উঠে বসে গৌরী বিমানকে বলে, কিন্তু কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন তা তো কই বললেন না?

একটা সুখবর দেবার আছে!

সুখবর!

হ্যাঁ।

কি বলুন তো?

ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, চলুন না।

কিন্তু ফিরতে রাত হলে বড়মা চিন্তিত হবেন। তাঁকে বলে এসেছি নটার মধ্যেই বাড়ি ফিরবো।

বেশ তো, না হয় দু'চার মিনিট এদিক ওদিক হবে। আমি নিজে পৌঁছে দেবো।

কিন্তু—

আপনার চিন্তা দেখে মনে হচ্ছে যেন আপনি জলে পড়েছেন মিস্ চ্যাটার্জী।

না, না—তা নয়—

কিন্তু আপনি আমার সামনে এত নার্ভাস হয়ে পড়েন কেন বলুন তো?

নার্ভাস হবো কেন?

তাই তো দেখছি।

প্রদীপ সেদিন গৌরীর সঙ্গে বিমান রায়কে দেখে বিস্মিত হলেও কলেজের অন্যান্য ছেলেরা ও মেয়েরা কিন্তু এতটুকু বিস্মিত হয়নি।

বিমান রায়ের সঙ্গে কোন মেয়ের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার ব্যাপারটাকে কলেজের ছেলেমেয়েরা কখনো একটা বিস্ময়কর বা আশ্চর্য ব্যাপার ভাবতে পারেনি কোন দিনই।

বরং একান্ত স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছে।

কারণ বিমানের বান্ধবী হবার সৌভাগ্য কোন মেয়েরই ছ'মাস বা এক বছরের বেশী থাকেনি।

বিমানের ধর্মই ছিল মধুপিয়াসী ভ্রমরের ধর্ম।

নতুন নতুন ফুলে মধু আহরণই যার জীবনের বিশেষ লক্ষ্য।

গৌরীর আগে ছিল রেখা সান্যাল।

গৌরীর 'পরে আকস্মিকভাবেই নজর পড়েছিল বিমানের।

এবং ছল করে গিয়ে গৌরীর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিয়েছিল।

কিন্তু বিমান জানতো না যে, গৌরীর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য তার কোন ছলের প্রয়োজন ছিল না।

সোজাসুজি আলাপ করতে গেলেও গৌরী তার সঙ্গে আলাপ করতো।

এবং সেইখানেই মারাত্মক ভুল করেছিল বিমান।

নিজের দৃষ্টি দিয়েই সে চিরদিন জগতের সব মেয়েদের দেখবার চেষ্টা করেছে কিন্তু এমন মেয়েও যে এ দুনিয়ায় থাকতে পারে যাকে তার চিরাচরিত দৃষ্টি দিয়ে চেনা সম্ভব নয়, সেটাই তার জানা ছিল না।

তাই আলাপ হবার পর সেই আলাপকে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত করতে গিয়ে প্রথম যেদিন আঘাত পেল বিমান, একটু যেন সে থমকেই গিয়েছিল।

সহজ সরল মেয়ে গৌরীর মধ্যেও যে একটা সুকঠিন বর্ম থাকতে পারে এবং সে বর্ম ভেদ করা যে সহজ নয় সেটা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই যেন গৌরীকে জয় করবার একটা জিদ চেপে যায় বিমানের।

অদ্ভুত মেয়েটার শান্ত মর্যাদাবোধ এবং লৌহকঠিন নিস্পৃহতা!

হাসিমুখে গৌরী সব কিছুকেই যেন উড়িয়ে দেয়।

সে এক নতুন অভিজ্ঞতা বিমানের।

এবং যত সে প্রতিহত হয় ততই যেন একটা অন্ধ ও দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে গৌরীর প্রতি।

সেই আকর্ষণের নেশাতেই বিমান যেন মত্ত হয়ে ওঠে।

গৌরীকে তার চাই-ই।

ছায়ার মতই ঘুরতে শুরু করে বিমান গৌরীর পিছনে পিছনে।

গৌরীর অবিশ্যি তাতে কোন ভ্রূক্ষেপই নেই যেন।

ব্যাপারটার মধ্যে যেন কোন গুরুত্বই নেই এইভাবে যত হাসিমুখে বিমানের যাবতীয় অত্যাচার সহ্য করে যায়, ততই বিমানের তার প্রতি তৃষ্ণাটা তীব্র হয়ে উঠতে থাকে।

অবশেষে বুঝি অনন্যোপায় হয়েই গৌরীকে বিবাহ করবে স্থির করে বিমান।

এবং বিমান তার মাকে গিয়ে একদিন বলে, সে তার বধূ মনোনীত করেছে।

বিমানের মা সংবাদটা পুত্রমুখে শুনে খুশীই হন।

ছেলের চরিত্রের কথা মা-বাপের কানে যে ওঠেনি তা নয়, কিন্তু ছোটবেলা থেকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে একমাত্র পুত্র তখন মা-বাপের সমস্ত নাগালের বাইরে।

অগত্যা তাঁদের চুপ করে সব সহ্য করে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

এবং তার মধ্যে দুঃখ ও মনোবেদনা কম ছিল না তাঁদের, বিশেষ করে বিমানের মার। সেই কারণেই ইতিপূর্বে বিমানের বিয়ে দেবার কম চেষ্টাও করেননি রায়বাহাদুরের পত্নী।

কিন্তু সফল হননি।

সেই বিমান আজ স্বেচ্ছায় বিবাহ করতে মত দিয়েছে!

বিমানের মা সেই দিনই গৌরীর যাবতীয় সংবাদ ছেলের কাছ থেকে সংগ্রহ করে স্বামীকে এক প্রকার জোর করেই পাঠিয়ে দিলেন গৌরীদের গৃহে।

প্রস্তাব শুনে গৌরীর বাবা কৃষ্ণকান্তবাবু তো হাতে স্বর্গ পেলেন।

এ যে স্বপ্নাতীত সৌভাগ্য।

তাঁর মত গরীব দুঃখী কেরাণীর মেয়ে লক্ষপতি রায়বাহাদুরের একমাত্র পুত্রের বধূ হবে!

গৌরী তাঁর সত্যিই সৌভাগ্যবতী।

কৃষ্ণকান্ত যেন একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়েন।

কি বলবেন, কি করবেন বুঝে পান না।

ছেলে বিয়ে করেনি, করছে না এবং তার চারিত্রিক দোষ ঘটেছে সে কারণে রায়বাহাদুরের অবিশ্যি নিজের তেমন কোন বিশেষ রকমের একটা দুশ্চিন্তা ছিল না।

গৌরীদের বাড়ি ছেলের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন তিনি একান্তভাবে স্ত্রীর তাগিদে এবং জেদাজেদিতেই, তাই গৌরীর বাবাকে কোনমতে কথাটা জানিয়ে তাঁর একটা সম্মতি নিয়ে চলে যেতে পারলে যেন বাঁচেন তখন রায়বাহাদুর।

রায়বাহাদুর আগেই বলেছিলেন কি করে গৌরীর সংবাদ তিনি পেয়েছেন। তাছাড়া, তাঁর ছেলে যখন পাত্রীকে দেখে পছন্দ করেছে তাঁদের বলবার কিছুই থাকতে পারে না।

কৃষ্ণকান্ত এক কথাতেই রাজী হয়ে গেলেন।

দু'একদিনের মধ্যেই স্বামী-স্ত্রী এসে কোন একটা দিন স্থির করে আশীর্বাদ করে যাবেন বলে বিদায় নিলেন রায়বাহাদুর বিজন রায় তখনকার মতো।

ঝড়ের মত এসে সংবাদটা দিয়ে আবার ঝড়ের মতই যেন চলে গেলেন রায়বাহাদুর!

কৃষ্ণকান্ত অন্দরে এসে প্রথমেই স্ত্রী সরমাকে কথাটা জানালেন।

সরমা শয্যায় শুয়ে ছিল, সব শুনে তারও আনন্দের যেন সীমা রইল না।

আহারাদি করে কৃষ্ণকান্ত অফিসে চলে গেলেন।

সরমা উমাকে কথাটা বলতে উমা কিন্তু কোন উৎসাহই দেখালো না।

সে চুপ করেই রইলো।

সরমা বললে, দিদি, তুমি যে কিছু বলছো না? গৌরী আমার পেটে হলেও আসলে সে তোমারই মেয়ে।

মেয়ে আমাদের বড় হয়েছে বৌ, লেখাপড়া শিখেছে, এক বছর বাদেই ডাক্তার হয়ে বেরুবে। স্বাধীনভাবে তাকে আমরা চলাফেরা করতে দিয়েছি, এখন তারও মতামতের একটা দাম আছে।

কি যে বল তুমি দিদি! যতই লেখাপড়া শিখুক—ছেলেমানুষ। ওর ভালমন্দ ও কি বুঝবে! তাছাড়া, এমন রাজার মত পাত্র—

না বৌ, তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে যেও না, হয়ত তাতে করে হিতে বিপরীতই হবে।

কিন্তু উনি যে কথা দিয়েছেন ভদ্রলোককে।

অন্যায় করেছেন দাদা হুট্ করে কথা দিয়ে।

এ কথা তুমি কেন বলছো বুঝতে পারছি না, দিদি! লক্ষপতির

ঘরের একমাত্র ছেলের বৌ হবে সে। তাছাড়া এক কলেজে যখন পড়ে, আলাপ-পরিচয়ও হয়ত আছে। তুমি দেখে নিও আমরা বললে সে নিশ্চয়ই অমত করবে না।

না করলেই ভাল।

উমা আর কথা না বাড়িয়ে উঠে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

সে-ঘর থেকে বের হয়ে সোজা নিজের ঘরে এসে বসে উমা।

গৌরীর মনের খবর অন্তত তার বুঝতে বাকী নেই।

গৌরী স্পষ্ট কোন দিন কোন কথা না বললেও তার মন যে কোথায় বাঁধা রয়েছে সেটা উমার অবিদিত ছিল না।

নিজের মন দিয়েই সে গৌরীর মনের কথাটা বুঝে নিয়েছিল।

তাছাড়া গৌরী। তারই হাতে গড়া গৌরী তার নাড়িছেঁড়া ধন প্রদীপের সহধর্মিণী হবে, মনে মনে কত দিনের কল্পনা তার!

এবং গৌরীর সঙ্গে বিয়ে হলে প্রদীপকে হয়তো সে আরো কাছে পাবে—এ জীবনে তার চাইতে আর কি বেশী চাওয়া থাকতে পারে তার!

কিন্তু এ কি সংবাদ শুনলো সে আজ!

উমা কি করবে বুঝতে পারে না।

কোন দিকে কোন দিশাই যেন খুঁজে পায় না। কি নিদারুণ দুর্ভাগ্য—শেষ আশাটুকুর মূলেও ভগবান এমনি করেই কুঠার হানছেন! কোন দিনই কি তার চোখের জল শুকোবে না!

॥ আট ॥

গৌরীকে নিয়ে বিমান সোজা এসে অন্ধকার ময়দানের ধারে গাড়িটা পার্ক করলো।

দূরে অন্ধকার আকাশে চৌরঙ্গীর নানা রঙের নিওন আলোর

বর্ণ বৈচিত্র্য দূর থেকে যেন স্বপ্নের হাতছানি মনে হয়।

অন্য দিকে অন্ধকারে কেল্লার আব্ছা ইশারা।

অন্ধকার নির্জন ময়দান।

এদিকে ওদিকে দু'একটা গাড়ি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে।

কি হলো, এখানে গাড়ি থামালেন কেন?

বললাম তো একটা সুসংবাদ তোমাকে দেবার আছে আমার।

তা তো বুঝলাম, তার জন্য—

এই অন্ধকার নির্জন ময়দানই তো সত্যিকারের পরিবেশ। চল ময়দানে ঘাসের 'পরে গিয়ে একটু বসা যাক।

কিন্তু রাত অনেক হয়ে গিয়েছে।—রেডিয়াম দেওয়া হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে গৌরী।

মাত্র সাড়ে নটা, এমন কি আর রাত। চল—

একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গৌরী আর কোন প্রতিবাদ না করে গাড়ি থেকে নেমে ময়দানের দিকে বিমানের সঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে চলে।

দু'জনে ঘাসের উপর এসে বসলো।

বলুন কি বলছিলেন।

তোমার যে বড্ড তাড়া দেখছি। বোসই না।

না বলুন, কি বলছিলেন।

বলছি। আমার বাবা আজ সকালে তোমার বাবার কাছে গিয়েছিলেন।

হঠাৎ!

হঠাৎই তো। পরশুই একেবারে মনস্থির করে ফেললাম যে—

মনস্থির করে ফেললেন?

হ্যাঁ। তোমাকে, তোমাকে না হলে আমার চলবে না।—বলতে বলতে সহসা হাত বাড়িয়ে গৌরীর একখানা হাত চেপে ধরে বিমান।

নিঃশব্দে নিজের হাতটা বিমানের মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে শান্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠে গৌরী বললে, কিন্তু তা সম্ভব নয়, বিমান বাবু।

গৌরী!

হ্যাঁ, কথাটা আপনার বাবাকে জানাবার আগে উচিত ছিল আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করা।

কি বলছো তুমি, গৌরী? Really, are you serious?

হ্যাঁ, উঠুন।—বলতে বলতে গৌরী উঠে দাঁড়ায়।

তুমি আমাকে বিবাহ করতে রাজী নও?

বললাম তো আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

কেন সম্ভব নয়, শুনতে পারি কি?

না। কারণ আপনার ঐ 'কেন'র কোন জবাব দেবার প্রয়োজন আমি বোধ করছি না।

চিরদিন হাত বাড়ালেই পাওয়ায় অভ্যস্ত বিমান।

অপ্রাপনীয় বলে তার অভিধানে কোন কিছু ছিল না! তাছাড়া, যাকে পেলে, তার ধারণা যে কোন মেয়েই নিজেকে কৃতার্থ মনে করবে, সে স্বেচ্ছায় বিয়ে করতে চাইছে—তবু রাজী নয় গৌরী!

নিজের আত্মাভিমানে প্রচণ্ড আঘাত লাগে যেন বিমানের।

অন্ধকারে চোখের মণি দুটো ধক্‌ধক্ করে যেন জ্বলে ওঠে।

কয়েকটা মুহূর্ত তার বাক্যস্ফূর্তি হয় না, তারপর চাপা কণ্ঠে বলে, কথাটা আর একবার ভেবে দেখলে বোধ হয় ভাল হতো, গৌরী।

ভাববার কিছু নেই, চলুন।—বলে যাবার জন্য পা বাড়ায় গৌরী।

শোন, গৌরী।

বলুন।

এই তাহলে তোমার শেষ কথা?

তাই।

তোমার মতের তাহলে পরিবর্তন হবে না?

না।

হুঁ। বেশ, চল।

এগিয়ে আসে বিমান। বলে, চল।

কিন্তু গৌরী বিমানের সঙ্গে অগ্রসর হয় না আর এক পাও।

হঠাৎ যেন পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। বলে, না—ধন্যবাদ। আপনি যান, আমার জন্য আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। আমি নিজেই যেতে পারবো।

বেশ। তবে এও তুমি জেনে রাখ গৌরী দেবী, বিমান রায়ের একটা চেহারাই তুমি দেখেছো—

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, অন্য চেহারাটার পরিচয় তুমি শীঘ্রই পাবে। Good night!

বিমান যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু পশ্চাৎ থেকে ডাকলো গৌরী, বিমানবাবু, আপনিও যাবার আগে একটা কথা তাহলে জেনে যান, যে সব মেয়েদের সঙ্গে আপনার তথাকথিত পরিচয়, গৌরী তাদের দলে নয়।

Is it?

হ্যাঁ।

কথাটা বলে গৌরী আর দাঁড়াল না, অন্ধকারে হন হন করে এগিয়ে গেল।

হাতের সিগারেটটা পায়ের নীচে ঘাসের উপর ফেলে পা দিয়ে সেটা পিষে ফেললো বিমান।

ঐ রকম ভাবে তার অজ্ঞাত প্রতিদ্বন্দ্বীকে পিষে ফেলতে পারলে বুঝি সুখী হ'ত সে!

গৌরী তখন দৃষ্টির বাইরে চলে গিয়েছে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত এগারোটা বেজে যায় গৌরীর সেদিন।

কৃষ্ণকান্ত ও সরমা দু'জনার খাওয়া হয়ে গিয়েছে। তাঁরা যে যার ঘরে নিদ্রিত। একা জেগে ছিল উমা তখনও গৌরীর অপেক্ষায়।

কলিং বেল টিপতেই উমা এসে দরজা খুলে দেয়।

গৌরী কোন কথা না বলে সোজা উমার পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় চলে যায়।

একই ঘরে গৌরী আর উমা শোয়।

এধারে একটা নেয়ারের খাটে শোয় গৌরী, অন্য দিকে মাটিতে একটা মাদুর বিছিয়ে শোয় উমা।

কি শীত, কি গ্রীষ্ম বরাবর আজ বিশ বছর ধরে ঐ ঘরে ঐভাবে শুয়ে আসছে উমা।

গৌরী অনেক বলেও উমাকে অন্য ঘরে শোয়াতে পারেনি।

খাটের ধারেই ছোট একটি পড়ার টেবিল আর শেল্‌ফে সাজানো গৌরীর যাবতীয় ডাক্তারী শাস্ত্রের বই ও খাতা, নোটপত্র।

তারই পাশে উত্তরের জানালাটা।

রাস্তা ঠিক ঐ উত্তরের জানালাটার নীচেই।

রাস্তার লাইটপোস্টের আলো ঐ জানালাপথে ঘরে এসে পড়ে।

গৌরী ঘরে ঢুকে ঐ জানালাটার ধারে এসে চুপ করে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল।

বিমানের ব্যবহারে মনটা তার সত্যিই যেন অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

বিমানের সঙ্গে সে যখন মিশতে শুরু করে অনেকেই অনেক কথা তাকে বলেছিল।

বান্ধবীদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে সাবধানও করে দিয়েছিল; কিন্তু তাদের সেই সাবধানবাণী হেসে উড়িয়ে দিয়েছে গৌরী।

কোন একজন ছেলে কোন একজন মেয়ের সঙ্গে যে একমাত্র কোন বিশেষ কুমতলবেই আলাপ করে বা করতে পারে গৌরী কখনো বিশ্বাস করেনি এ কথাটা।

সহজ সরল সম্পর্কও তো উভয়ের গড়ে উঠতে পারে।

সত্যি কথা বলতে কি, বিমানের সঙ্গে আলাপ হবার পর তার যে কিছুটা বেচাল কোন কোন সময় লক্ষ্য করেনি গৌরী তা নয়, কিন্তু আমল দেয়নি এতটুকু। দেবার কোন প্রয়োজনই বোধ করেনি।

এবং সেটাকে সে সাধারণ চঞ্চলতা বলেই বরাবর ধরে নিয়েছে।

কিন্তু আজ সত্যিই সে বিমানের ব্যবহারে আঘাত পেয়েছে।

অকস্মাৎ যেন আজ ঘণ্টাখানেক আগে বিমানের মুখোশটা খুলে গিয়েছিল।

গৌরী!

উমার ডাকে গৌরী কোন সাড়া দেয় না।

খাবি না?

তবু সাড়া দেয় না গৌরী।

কি রে, কথা বলছিস না কেন?

গৌরী ফিরে তাকাল না উমার দিকে। তার দু'চোখের কোল বেয়ে তখন ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল।

ধরা গলায় সে কেবল বললে, খিদে নেই।

তা হোক। রাত-উপোসী থাকতে নেই। হাত-মুখ ধুয়ে নীচে আয়।—কথাটা বলে উমা নীচে চলে গেল।

আহারে রুচি সে রাত্রে আর সত্যিই ছিল না গৌরীর। কিন্তু জানে যে কিছু অন্তত মুখে না দিলে বড়মা তাকে নিষ্কৃতি দেবে না।

তাই সে বললে, তুমি যাও, আমি আসছি।

আহার্যের সামনে বসেও গৌরী কিছু খেতে পারলো না। এটা ওটা নাড়াচাড়া করে এক সময় উঠে গেল।

মেয়ের থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে উমাও আর বিশেষ পীড়াপীড়ি করলো না।

॥ নয় ॥

পরের দিন সকালে গৌরী হাসপাতালে ডিউটি দেবার জন্য যখন বের হচ্ছে, কৃষ্ণকান্ত তাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন।

তোমার বিয়ের আমি স্থির করেছি, গৌরী! কোন রকম ভনিতা

না করে স্পষ্টাস্পষ্টি সোজাসুজিই একেবারে কথাটা বললেন মেয়েকে কৃষ্ণকান্ত।

গৌরী মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

পাত্রের সঙ্গে শুনলাম তোমার পরিচয় আছে। তোমাদেরই কলেজে ডাক্তারি পড়ে।—আবার বলেন কৃষ্ণকান্ত।

তথাপি গৌরী নীরব।

তোমার মারও খুব ইচ্ছা ঐখানেই তোমার বিয়ে হয়।

বিয়ে আমি করবো না।

শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে এতক্ষণে কথাটা বললে গৌরী পূর্ববৎ মাথা নীচু করেই।

কি বললে ?

বিয়ে আমি করবো না।

কিন্তু আমি যে পাত্রের বাপকে কথা দিয়েছি!

কথা ফিরিয়ে নিন।

না, তা হয় না—তুমি জান না পাত্র হিসেবে বিমানের মত ছেলে আমাদের কল্পনাতীত। বিজন রায় লক্ষপতি।

সব জানি। আমি আমার যা বলবার ছিল বললাম।—কথাটা বলে গৌরী ঘর থেকে বের হয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই পিছন থেকে কঠিনকণ্ঠে কৃষ্ণকান্ত ডাকলেন, গৌরী দাঁড়াও, শোন, ছেলের বাপকে যখন আমি কথা দিয়েছি ঐখানেই তোমাকে বিয়ে করতে হবে।

গৌরী একবার মাত্র কৃষ্ণকান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল, কোন জবাব দিল না বাপের কথার আর।

কৃষ্ণকান্ত অত্যন্ত রোখা প্রকৃতির লোক।

তিনিও মনে মনে স্থির করলেন এমন সুবর্ণ-সুযোগ যখন তাঁর মেয়ের জীবনে এসেছে তখন কোনমতেই তা তিনি হাতছাড়া হতে দেবেন না।

গৌরীর বিবাহ তিনি সেখানে দেবেনই।

স্ত্রীকে মেয়ের ঔদ্ধত্যের কথা বলে বললেন, মেয়েকে তোমার জানিয়ে দিও, ঐখানেই তার বিয়ে আমরা দেবো।

সরমা হাঁ বা না কোন কথাই বললে না।

এ দিকে কৃষ্ণকান্ত অপেক্ষা করতে লাগলেন রায়বাহাদুর কবে আসবেন তার জন্য। কিন্তু দিন-দুই বাদে—রায়বাহাদুর এলেন না, এলো তাঁর ড্রাইভার একটা চিঠি নিয়ে রায়বাহাদুরের কাছ থেকে।

সংক্ষিপ্ত চিঠি—'এ বিয়ে হবে না'।

চিঠিটা পেয়ে কৃষ্ণকান্ত কিন্তু সত্যিই যেন হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়লেন।

চিঠিটা হাতে নিয়ে বাইরের ঘরে অনেকক্ষণ বসে রইলেন, তারপর এসে স্ত্রীর ঘরে ঢুকলেন।

সরমার পঙ্গু অসাড় পায়ে একটা কবিরাজী তেল মালিশ করে দিচ্ছিল উমা। কৃষ্ণকান্তকে অসময়ে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে দু'জনেই মুখ তুলে তার দিকে তাকালো।

এই নাও সরমা, তোমার মেয়েকে বলো এ বিয়ে তার আর করতে হবে না; কারণ তারাই এ বিয়ে ভেঙে চিঠি দিয়েছে! চালচুলোহীন ভিখিরীর মেয়ে চিরদিন ভিখিরীই থাকে। রাজপ্রাসাদ তাদের ভাগ্যে জুটবে কেন?

শেষের দিকে কৃষ্ণকান্তর গলার স্বরে কেমন যেন একটা হতাশার বেদনাই ঝরে পড়ে।

চিঠিটা স্ত্রীর সামনে ফেলে দিয়ে কৃষ্ণকান্ত বের হয়ে যাচ্ছিলেন, পিছন থেকে মৃদুকণ্ঠে ডাকলো উমা, দাদা!

ফিরে দাঁড়ালেন কৃষ্ণকান্ত।

একটা কথা বলছিলাম যদি কিছু মনে না করেন!

কি?

রায়বাহাদুরের মত অবস্থা না হলেও আমি একটি সদ্‌বংশজাত অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলের সন্ধান দিতে পারি। ছেলেটি শুধু অবস্থাপন্ন ঘরেরই নয়—শিক্ষিতও।

একটু যেন বিস্মিত হয়েই উমার মুখের দিকে তাকালেন কৃষ্ণকান্ত।

এই পাড়াতেই ছেলেটি থাকে। গত বছর ডাক্তারি পাস করেছে ছ'টা সোনার পদক নিয়ে।

এই পাড়াতেই থাকে, ডাক্তার—?

হ্যাঁ, চৌধুরীবাড়ির ছেলে।

কে—ঐ ব্যারিস্টার হিমাদ্রি চৌধুরীর ছেলে?

হ্যাঁ।

কিন্তু বোন, সে আমার মেয়েকে পুত্রবধূ করে নেবে কেন?

নেবে।

কি করে জানলে?

আপনি একবার চেষ্টা করে দেখুন না!

কিন্তু যদি অপমান করে তাড়িয়ে দেয়?

দিলেই বা, চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি? মেয়ে যখন, দায় আমাদেরই।—কথাটা বলে সরমা।

তা নয় সরমা, ভাবছি তোমার মেয়ের কথা। তোমরাই না বলো তার পরামর্শ নেওয়া দরকার তাই বলছিলাম।

আপনি চেষ্টা তো করুন, বললে উমা, সেদিক থেকে অমত হয়ত হবে না।

না হলেই ভাল। বেশ, বলছো তোমরা চেষ্টা করে দেখবো।

পরের দিন সন্ধ্যার দিকে গিয়ে হাজির হলেন কৃষ্ণকান্ত হিমাদ্রির গৃহে।

প্রদীপ বাড়িতেই ছিল, গৌরীর বাবার পরিচয় পেয়ে তাঁকে বললে, বাবা তো নেই, শরীর অসুস্থ বলে বাইরে আছেন।

ও। তা—আমি তো তা জানতাম না। আচ্ছা, আমি তাহলে উঠি।

কোন বিশেষ কাজ ছিল কি বাবার কাছে? কোন মামলা-মকদ্দমার ব্যাপার—

না, না—বাবা, সে রকম কিছু নয়। অবিশ্যি তোমার মার সঙ্গে কথা বলতে পারলেও হতো—তা—

মার সঙ্গে দেখা করবেন? আচ্ছা আপনি তাহলে বসুন, আমি দেখছি।

প্রদীপ ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

একটু পরেই ফিরে এসে বললে, চলুন উপরে।

ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছেন অমিতাকে পূর্ণ বিশ্রাম নিতে।

তার উপরে প্রদীপের কঠোর অনুশাসন। অমিতাকে বেশীর ভাগ শয্যাতেই শুয়ে থাকতে হয় বা একটা আরাম কেদারায় বসে থাকতে হয়।

চেহারাও অমিতার অনেক শীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

চোখে মুখে একটা বিষণ্ন ক্লান্ত ছায়া পড়েছিল।

অমিতা কৃষ্ণকান্তকে সাদরে আহ্বান জানালো এবং মৃদু হেসে বলল, আসুন, বসুন। ডাক্তার ছেলে কি না—কড়া শাসন সর্বদা, রেস্ট নিতে হবে।

প্রদীপই বললে, মা অসুস্থ—

লজ্জিত কৃষ্ণকান্ত বললেন, তবে তো বড় অন্যায় করলাম, অসুস্থ আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম, মিসেস্ চৌধুরী।

না, না—বসুন আপনি, ওর কথা শোনেন কেন? ও-ই বরং সর্বদা আমাকে শুইয়ে বসিয়ে রেখে অসুস্থ করে ফেললো।

তাহলে আপনারা কথা বলুন, মা, আমি একবার হাসপাতালে বেরুব।—প্রদীপ বলে।

কখন ফিরবি?

বেশী দেরি হবে না। কিন্তু রাত আটটায় ঠিক ট্যাবলেটটা খেয়ো, আবার ভুলে বসে থেকো না যেন।

না রে, না—তুই দেরি করিস না।

না, দেরি হবে না।

প্রদীপ নমস্কার জানিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

অমিতা এবারে বলে, কৃষ্ণকান্তবাবু, আপনি এসেছেন, কী যে খুশী হয়েছি, তবে আপনি না এলেও আমিই হয়ত আপনার কাছে লোক পাঠাতাম।

কেন বলুন তো?

এক বছর ধরে ওঁর শরীর অসুস্থ, তাই উনি চেঞ্জেই রয়েছেন, আমারও শরীরের অবস্থা এই, আমি প্রদীপের বিয়েটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে চাই।

মিসেস্ চৌধুরী!

হ্যাঁ, শুনেছি আপনার একটি মেয়ে আছে—গৌরী। ডাক্তারি পড়ে, তাই না?

হ্যাঁ, সামনেবার ফাইন্যাল দেবে।

জানি। চোখে না দেখলেও আমার ছেলের মুখে তার কথা শুনে শুনে সে আমার পরিচিতা। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো আপনার মেয়ে গৌরীকে আমি পুত্রবধূ করে নিয়ে আসতে চাই।

এ তো আমার পরম সৌভাগ্যের কথা মিসেস্ চৌধুরী। সত্যি কথা বলতে কি, ঐ প্রস্তাবটি নিয়েই অনেক সঙ্কোচের সঙ্গে আপনাদের কাছে আজ আমি এসেছিলাম।

তারপর আরো আধঘণ্টা বসে অনেক আলাপ করে হৃষ্টচিত্তেই কৃষ্ণকান্ত অমিতাকে বার বার নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন।

॥ দশ ॥

যে সময় ঐ দিন সন্ধ্যায় অমিতার শয়নঘরে বসে অমিতা ও কৃষ্ণকান্ত কথা বলছিলেন, ঠিক সেই সময় গঙ্গার ধারে পাশাপাশি বসে কথা বলছিল প্রদীপ আর গৌরী।

হাসপাতালে হঠাৎ সেদিন গৌরীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় প্রদীপের। গৌরীকে দেখে প্রদীপ এড়িয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু গৌরীই তাকে ডাকে, প্রদীপ!

প্রদীপ যেন গৌরীর ডাকটা শুনতে পায়নি এইভাবে পাশ কাটাবার চেষ্টায় ছিল; কিন্তু গৌরী একটু দ্রুত এগিয়ে তার সামনাসামনি একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়।

কি ব্যাপার, এড়িয়ে যাচ্ছো যে?

কি জানি, যদি না চিনতে পারো! তাই ভাবলাম—

চিনতে পারবো না বলেই বুঝি ডাকা সত্ত্বেও নিজে এড়িয়ে যাচ্ছিলে? শোন, আজ ক-দিন থেকে তোমার কথাই ভাবছিলাম।

আমার কথা?

হ্যাঁ, মাস তিনেক তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। হাসপাতালেও নিয়মিত তোমাকে দেখি না।

হাসপাতালে তো নিয়মিত আসি না।

তার মানে এখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়েছো নাকি?

হ্যাঁ, আমার এক বন্ধু কেবিনে আছে, আজ তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।

তা চাকরি হঠাৎ ছেড়ে দিলে যে?

চেম্বারে প্র্যাকটিস্ করছি।

কেন, বিলেত যাবে না?

আপাততঃ কিছুদিন নয়।

তা এখন কোথায় চলেছো?

চেম্বারে যাবো একবার ভাবছি।

চল।

কোথায়? আমার সঙ্গে চেম্বারে যাবে নাকি?

না। চল, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

দু'জনে এসে প্রদীপের গাড়িতে উঠে বসলো।

সরে বোস, আমি ড্রাইভ করবো।

তুমি ড্রাইভ করবে? বেশ—

গৌরী ড্রাইভিং সীটে বসলো তার পাশে।

গৌরী প্রদীপের কাছেই ড্রাইভিং শিখেছিল একসময়।

গাড়ি চালায় গৌরী। গাড়ির মধ্যে ছু'জনার বিশেষ কোন কথা হয় না।

গৌরী সোজা ড্রাইভ করে এসে গঙ্গার ধারে গাড়ি পার্ক করলো।

নামো।—গৌরী বলল।

দ্বিরুক্তি না করে গাড়ি থেকে নামলো প্রদীপ।

চল ঐ বেঞ্চটায় গিয়ে বসি।

গোরীর আহ্বানে এবারেও কোন আপত্তি না তুলে নিঃশব্দে গঙ্গার একেবারে ধার ঘেঁষে যে বেঞ্চটা পাতা ছিল, সেটার দিকে গৌরীর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেল।

বোস।

বসলো প্রদীপ।

সামনেই গঙ্গা।

রাত্রির অন্ধকারে গঙ্গার বুকে আলো পড়ে যেন স্বপ্নের আল্‌পনা এঁকেছে।

ঢেউ গড়ছে, ঢেউ ভাঙছে।

আর সেই ঢেউয়ের ভাঙা-গড়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোর আল্‌পনা কাঁপছে।

ছু'জনে পাশাপাশি বসে।

কারো মুখে কোন কথা নেই।

মুখে কথা নেই কেন?—আড়চোখে পার্শ্বে উপবিষ্ট প্রদীপের দিকে তাকিয়ে শুধায় গৌরী একসময়।

কি বলবো বল?—তাকালো আব্‌ছা আলো-অন্ধকারে গৌরীর মুখের দিকে প্রদীপ।

কেন, আমাকে বলবার মত কথা যা ছিল সব বুঝি ফুরিয়ে গিয়েছে?

মৃদু হাসলো প্রদীপ।

হাসছো যে?

তুমিই তো আমাকে ডেকে নিয়ে এলে, কী বলবে বলে!

তা না হয় ডেকেই এনেছি, কিন্তু তাই বলে তুমি বোবা হয়ে থাকবে সে কথাও বলেছিলাম নাকি?

জান তো বোবার শত্রু নেই।

জানি। তবে যে সত্যি বোবা নয় সে যদি বোবা হয়ে থাকে তাহলে কি মনে হয় জান?

কি?

বোবা হওয়াটা তার ভান। সত্যি, কি হয়েছে তোমার বল তো? তিন মাস পরে দু'জনের দেখা হলো—

দেখা করবার চেষ্টা তো করোনি।

তুমিই কি করেছ?

যদি বলি করেছিলাম?

করেছিলে মানে?

দেখলাম তুমি ব্যস্ত, তাই সাহস হলো না এগুতে।

সাহস আছে খুব তোমার তাহ'লে—মানতেই হবে। তা ব্যস্তই যখন দেখলে তখন জিজ্ঞাসা করলেও তো পারতে কি নিয়ে ব্যস্ত আমি।

সব কথাই কি সব সময় জিজ্ঞাসা করা যায়?

যায়। ইচ্ছা থাকলেই জিজ্ঞাসা করা যায়।

বেশ। জানা রইলো কথাটা। কিন্তু কই, যা বলবে বলেছিলে এখনো তো বললে না!

তুমি শুনছো কই!

বলো।

বিমান আমাকে বিয়ে করতে চায়।

প্রদীপ চুপ করে থাকে কথাটা শুনেও।

চুপ করে আছো যে?

কি বলবো?

কেন, কিছুই কি বলবার নেই?

তোমার কথাটা না জেনে বলি কি করে ?

আমার কথাটা জানতে আজো তোমার বাকী আছে নাকি ?

বাকী নেই বলেই তো জানতাম। কিন্তু—

কি কিন্তু, থামলে কেন, বলো ?

না থাক।

থাকবে কেন, বলো !

মনে হচ্ছে বোধ হয় জানতে পারিনি।

তাহলে ?

কি তাহলে ?

না, তাই ভাবছি।

কি ভাবছো ?

কিছু না।

কয়েকটা মুহূর্ত অতঃপর গৌরী চুপ করে থাকে, তারপর সহসা পার্শ্বে উপবিষ্ট প্রদীপের কোলে মুখ গুঁজে নিজেকে যেন প্রদীপের কাছে সঁপে দিয়ে কেঁদে ফেলে।

বিমূঢ় বিহ্বল প্রদীপ হঠাৎ প্রথমটায় বুঝে উঠতে পারে না কি করবে।

এ শুধু অপ্রত্যাশিতই নয়, স্বপ্নাতীত প্রদীপের কাছে।

কিছুক্ষণ ঐভাবে বসে থেকে একসময় ধীরে ধীরে গৌরীর মাথায় হাত বুলোতে শুরু করে।

গৌরী তখনও কাঁদছে বুঝতে পারে।

কিছুক্ষণ ঐভাবে গৌরীকে কাঁদতে দেয় প্রদীপ, তারপর একসময় মৃদুকণ্ঠে ডাকে, গৌরী !

উঁ।

চল, ওঠো—বাড়ি যাবে না ?

না।

ওঠো, চল।

আগে তুমি বল।

কি বলবো ?

তুমি—তুমি—

একটা সুখবর তোমাকে দিচ্ছি।

কি ?

তোমার বাবা আজ আমাদের বাড়িতে গিয়েছেন।

সত্যি ? গৌরী জলে-ভেজা চোখ তুলে তাকায় প্রদীপের মুখের দিকে।

হ্যাঁ, সত্যি ! কিন্তু সত্যিই বাইরে হিম পড়ছে, চল।

চল। গৌরী উঠে দাঁড়ালো।

॥ এগারো ॥

চব্বিশ বছরের জীবনে এতখানি অপমানিত বিমান সত্যিই বুঝি কোন মেয়ের কাছে আর হয়নি আজ পর্যন্ত।

গৌরীর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হবার পর কটা দিন বিমান যেন পাগলের মতই ঘুরে বেড়ায়, আর রুদ্ধ আক্রোশে জ্বলতে থাকে নিজের মধ্যে নিজে সর্বক্ষণ।

নিরেট মূর্খ সে, নচেৎ গৌরীর মত একটা মেয়েকে শেষ পর্যন্ত সে কি না বিয়ে করতে চেয়েছিল !

কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই সঙ্গে একটা কথাই মনে হয়, গৌরী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। স্পষ্ট মুখের উপরে 'না' বলে দিয়েছে।

অপমানের সেই জ্বালাটা আরো যেন দ্বিগুণ হয়ে তাকে পোড়াতে থাকে, যখন জানতে পারে প্রদীপ চৌধুরীর সঙ্গে গৌরী চ্যাটার্জীর বিবাহের সব স্থির হয়ে গিয়েছে।

তার ঈপ্সিতাকে শেষ পর্যন্ত কিনা ঐ প্রদীপ চৌধুরী নিয়ে যাবে ?

কথাটা যতই ভাবে বিমান, ততই যেন নিরুপায় আক্রোশে নিজের মধ্যেই নিজে ছটফট করতে থাকে।

কি করে এ বিয়ে ভেঙে দেওয়া যায়, কি করে গৌরীকে অপদস্থ করা যায় দিবারাত্র ভাবতে থাকে বিমান, কিন্তু কোন পথ খুঁজে পায় না। কেবলই মনে হয়, গৌরী তার নাগালের বাইরে, গৌরীকে সে স্পর্শও করতে পারবে না।

বন্ধুবান্ধব কারো কাছে এ কথা বলতেও পারে না বিমান। বলবারও নয়—পরামর্শ নেবারও উপায় নেই। এ জ্বালা, নিজের বুকের জ্বালা। জ্বালাটা যেন তার দ্বিগুণ হয়েছে প্রদীপের সঙ্গে বিবাহ হচ্ছে জানতে পেরে। সেখানেই গৌরীর কাছে যেন তার চরম পরাজয় ঘটতে চলেছে। আরো শুনছে বিমান, বিয়ের পর নাকি প্রদীপ গৌরীকে নিয়ে বিলেত যাবে, গৌরীর ফাইন্যাল এম. বি. পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই।

বন্ধুবান্ধবদের কাছে না বললেও বিমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রসূন কিন্তু ব্যাপারটা কিছু কিছু জানতো।

গৌরীকে নিয়ে বিমান কিছুদিন রীতিমত মেতে উঠেছিল, সর্বক্ষণই প্রায় তার পিছনে পিছনে ঘুরতো—একথা জানতো প্রসূন।

প্রসূন গৌরীকেও চিনতো ভাল করেই। তাই একদিন সে বলেছিল বিমানকে, বিমান, গৌরী চ্যাটার্জী কিন্তু তোমার মাধবী, সুজাতা, সুপ্রিয়ার দলে নয়।

তাই নাকি ?—বাঁকা চোখে শুধিয়েছিল কথাটা বিমান।

হ্যাঁ।

কিন্তু আমি তো জানি বন্ধু, সব মেয়েই সমান।

তোমার মত অবিশ্যি মেয়েদের অভিজ্ঞতা আমার নেই বিমান, তবে গৌরী চ্যাটার্জীকে চিনি আর জানিও কিছুটা। তাই মনে হয় —

কি ?

তোমার চিরদিনের পথ ধরে চললে হয়ত ভুলই করবে।

Thank you for the timely warning !

কথাটা বলেছিল বিমান।

গৌরীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার কয়েকদিন পর প্রসূনের সেদিনকার কথাটাই বেশী করে যেন বিমানের মনে হতে থাকে, এবং প্রসূনকে সর্বদা সেই কারণেই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে যেন বিমান।

প্রসূন দু'চারদিন বিমানের বাড়িতে খোঁজ করতে এসেও তার দেখা পায় না। বিমান নাকি বাড়ি থেকেই বের হয় না।

কিন্তু বিমানকে একদিন অতর্কিতেই একটা হোটেলের লাউঞ্জে ধরে ফেললো প্রসূন।

বিমান কোণের একটা টেবিলে একা একা বসে মদ্যপান করছিল।

হ্যাল্লো!

বিমান প্রসূনের গলায় মুখ তুলে তাকালো, কিন্তু কোন আহ্বান জানালো না।

বিমানের দিক থেকে কোন সাদর আহ্বান না এলেও অবিশ্যি প্রসূনের কিছু যায়-আসে না। সে বিমানের মুখোমুখি একটা খালি চেয়ার দখল ক'রে বসে পড়ে। বলে, তোর ব্যাপারটা কি বল্ তো বিমান?

কেন?

কেন কি, একেবারে যাকে বলে গা-ঢাকা দিয়েছিস!

গা-ঢাকা দিতে যাবো কেন?

উহুঁ, কণ্ঠস্বরও নিস্তেজ, মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই সামথিং সিরিয়াস। কি, ব্যাপার কি, গৌরী চ্যাটার্জীর refusal নয় তো?

সন্ধ্যা থেকে ইতিমধ্যেই বিমানের পেটে বেশ কয়েক পেগ পড়েছিল, তার ক্রিয়াও তখন চলেছিল দেহের শিরায় শিরায়, একান্ত অসংলগ্নভাবেই বিমানের মুখ দিয়ে যেন কথাটা বের হয়ে গেল।

বিমান বললে, But I won't spare her! এত সহজে বিমান রায় তাকে নিষ্কৃতি দেবে না প্রসূন, তুইও জেনে রাখিস।

তাহলে যা সন্দেহ করেছিল প্রসূন ব্যাপারটা তাই।

গৌরী চ্যাটার্জীর নির্মম প্রত্যাখ্যানেরই আঘাত।

মৃদু হাসলো প্রসূন নিঃশব্দে।

• •

আরো আধঘন্টাটাক পরে।

দুই বন্ধু তখন আরো কয়েক পেগ উদরস্থ করে দু’জনা দু’জনের মুখোমুখি বসেছে।

প্রসূন বলে, তাহলে কি করবি ঠিক করেছিস?

ভাবছি—কথাটা বলে গ্লাসটা আবার ওষ্ঠপ্রান্তে তুলে ধরে বিমান।

প্রসূনের হাতের অর্ধদগ্ধ সিগারেটের একটা ধোঁয়ার বঙ্কিম রেখা বাতাসে ছড়িয়ে যেতে থাকে।

এক কোণে অর্কেস্ট্রা বাজছে।

বিমান!

বল।

একটা পুরনো প্যাঁচ কষলে কেমন হয়?

মানে?

বলছিলাম there is nothing unfair in love and war!

স্পষ্ট করে বল।

একটা উড়ো চিঠি দে না।

উড়ো চিঠি মানে!

প্রদীপ চৌধুরীর মাকে।

না, ওটা বড্ড সেকেলে, পচা ট্যাক্‌টিক্‌স্‌। তাছাড়া প্রদীপ চৌধুরী হয়ত হেসেই উড়িয়ে দেবে।

ফুল, তুই প্রদীপ চৌধুরীকে চিঠি দিবি কেন!

তবে?

তার মাকে।

কিন্তু—

দিয়েই একটা দেখ না। শেষ পর্যন্ত যদি চিঠিতে কাজ না-ই হয়, অন্য কিছু ইতিমধ্যে ভাবা যাবে।

বলছিস ?

ঢিল ছুঁড়ে একটা দেখতে ক্ষতি কি ! লক্ষ্য ভেদ হয় ভালই, নচেৎ এখনো তো সময় আছে—

ডাকে দেবো চিঠি ?

না, না—ডাক ফাক নয় একেবারে হাতে হাতে।

কে যাবে চিঠি নিয়ে তবে,—আমি ? রক্ষে কর—

ইডিয়ট ! তুই যাবি কেন ?

তবে কে, তুই ?

উহুঁ।

তবে ?

তোদের ঐ বুড়ো দরোয়ান কিষণলালকে দিয়ে চিঠিটা পাঠিয়ে দে না।

ব্যাপারটায় বিমানের সত্যিই তেমন কোন উৎসাহ ছিল না, কিন্তু প্রসূনের উৎসাহে শেষ পর্যন্ত মত দিতেই হলো।

কিন্তু চিঠিটা লিখবে কে ? আমি ও সব লিখতে পারবো না।

সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। লিখবো আমিই।

॥ বারো ॥

অমিতার কেন যেন মনে হচ্ছিলো আর তার খুব বেশী দিন নেই।

শরীরটা তার মনের ব্যাধিতে সত্যিই একেবারে ভেঙে পড়েছিল। তাছাড়া হিমাদ্রির ফেরার আশাও একরকম সে ছেড়ে দিয়েছিল।

দীর্ঘ তের মাস হিমাদ্রি গৃহছাড়া।

এই তের মাসে হিমাদ্রির ত্ন-ছত্র সংবাদও পায়নি অমিতা।

যত দিন যাচ্ছিলো হিমাদ্রির নিরুদ্দেশ হওয়ার ব্যাপারে অমিতা যেন নিজেকেই বেশী দোষী মনে করছিল। কেবলই তার ঘুরে ফিরে মনে হতো, অন্ধ অভিমানে এমনি করে সে যদি স্বামীর দিক

থেকে মুখ ফিরিয়ে না থাকতো, হয়ত কোথাও কোন ভ্রান্তি বা ত্রুটি থাকলে তার একটা মীমাংসা হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু সে ই সে পথ চিরদিনের মত রুদ্ধ করে দিয়েছে।

সংসারের প্রতিও অমিতার তাই বুঝি আর কোন মমতা ছিল না।

এখন একমাত্র কর্তব্য তার প্রদীপের বিবাহ দিয়ে তাকে সংসারী করে দিতে পারলেই শেষ হয়ে যায়। তারপর তার মুক্তি। তার ছুটি !

তাই অমিতা প্রদীপের সমস্ত আপত্তি একপ্রকার অগ্রাহ্য করেই প্রদীপের বিবাহের সব স্থির করে ফেলেছিল।

পিতা এক বৎসরের উপর নিরুদ্দেশ, মা অসুস্থ, প্রদীপের আদৌ ইচ্ছা ছিল না সে এখন বিবাহ করে। মাকে তাই সে বলেছিলও, তোমার মনোমত পাত্রীকেই আমি বিয়ে করবো কিন্তু এখন নয় মা।

না বাবা, না—তুই আর অমত করিস না।

কিন্তু কেন তুমি ব্যস্ত হচ্ছো মা! বিয়ে তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।

পালিয়ে তো যাচ্ছে না, তবু—তবু আমার বড্ড ভয় করে প্রদীপ।

ভয়! ভয় কিসের, মা ?

তুই বুঝবি না, বাবা। আর তোকে বলতেও পারব না। যে কর্তব্য মাথায় তুলে নিয়েছি—

কর্তব্য ?

হ্যাঁ রে। সে কর্তব্য যে আমাকে শেষ করে যেতেই হবে। নইলে যে আমার মুক্তি নেই রে, মুক্তি নেই।

প্রদীপ অমিতার কথাগুলো সত্যিই বুঝতে পারে না। বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

প্রদীপের হাতটা ধরে অমিতা বলে, তুই আর অমত করিস না, বাবা।

কিন্তু মা—

তোকে আজ আমি কেমন করে বোঝাব বাবা, আজ আমি কত অসহায়, কত দুর্বল হয়ে পড়েছি।—কথাটা বলতে বলতে অমিতার মাথাটা হেলে পড়ে বালিশের উপর।

চোখ দু'টো বুজে আসে। ঠোঁট দু'টো কাঁপতে থাকে।

মা, মা—কি হলো মা, মা—

অমিতার কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বড় ডাক্তারকে ফোন করে দেয় প্রদীপ।

নিজে মার নাড়ি ধরে বসে থাকে।

কয়েক মিনিট পরে অমিতা চোখ খোলে।

মা!

প্রদীপ!

তোমার কথার আর অবাধ্য হবো না, মা। তুমি যা বলবে তাই হবে।

আমি জানতাম বাবা, তুই আমার কথা ফেলবি না।

অমিতার শীর্ণ গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে।

অমিতা শয্যায় শুয়ে শুয়েই প্রদীপের বিবাহের সব ব্যবস্থা করতে থাকে।

বৃদ্ধ সরকার রামজীবনবাবুকে ডেকে বলে অমিতা, সমস্ত বাড়ি রং করান সরকার মশাই। সমস্ত বাড়ি আলো দিয়ে সাজাবেন।

যা আপনি বলছেন তাই হবে মা।

হ্যাঁ, তিন দিন ধরে রোশনচৌকী বসবে, আমার খোকার বিয়ে। বিয়ের দিন আর বৌভাতের দিন বাজি পোড়ানো হবে। খরচের জন্য ভাববেন না।

তাই হবে মা। কিন্তু মা—

কি সরকার মশাই?

বাবু যে এখনো ফিরলেন না।

অমিতা বাড়ির সকলের কাছেই বলেছিল হিমাদ্রি বিদেশ ভ্রমণে গিয়েছে। রামজীবনবাবুও তাই জানেন।

বাবু সম্ভব হলে ঠিক সময়েই আসবেন, আপনি ভাববেন না।

রামজীবনবাবু আর কোন কথা বলেন না।

চৌধুরীবাড়িতে যেন সাড়া পড়ে যায়।

নতুন রং পড়ে বাড়ির দেওয়ালে আর জানালা দরজায়।

কতকাল পরে নিরানন্দ চৌধুরীবাড়ির জানালা-পথে যেন আনন্দের হাওয়া বয়ে আসছে।

গৌরীদের বাড়িতেও আসন্ন উৎসবের সাড়া জাগে।

সবচাইতে বেশী আনন্দ আজ বুঝি উমার।

তার প্রদীপের বৌ হতে চলেছে আজ গৌরী।

নিজের হাতে গড়া গৌরী।

বিয়ের আর মাত্র তিন দিন বাকী।

প্রদীপ নীচে লাইব্রেরী-ঘরে বসে কী একটা বই পড়ছিল, ভৃত্য এসে তার হাতে একখানা চিঠি দিল।

কে চিঠি দিল?

একটা বুড়ো দরোয়ান এসে চিঠিটা দিয়ে গেল দাদাবাবু!

দরোয়ান কোথায়?

সে তো চলে গেছে।

প্রদীপ দেখলো তার মার নামে চিঠি।

মার নামে আবার কে হাতে লিখে চিঠি দিয়ে গেল। গত দশ বছরে কেউ তো কখনো চিঠি দেয়নি তার মাকে।

কেমন যেন কৌতূহল বোধ করে প্রদীপ। চিঠিটা খুলে ফেলে।

চিঠিটা পড়ে প্রদীপ সত্যিই বিস্মিত হয়। কে এমন গৌরীদের পরিচিত আছে যে, এমন করে চিঠিতে গরল উদ্গীরণ করতে পারে?

কয়েকটা মুহূর্ত কি যেন ভাবলো সে, তারপর মৃদু হেসে চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে জানালা-পথে বাইরে ফেলে দিল।

এদিকে কিষণলাল চিঠিটা দিয়ে ফিরে আসতেই বিমান জিজ্ঞাসা করে, চিঠিটা দিয়ে এসেছো দরোয়ানজী ?

হ্যাঁ সাব। লেকেন ও কোঠি তো হামারা বহুৎ জান-পয়ছানা হ্যায়।

ও বাড়ি তোমার চেনা ?—বিমান জিজ্ঞাসা করে।

হ্যাঁ, বহুৎ রোজ ও কোঠিমে হামি কাম করেছিলাম। আর ঐ যে দাদাবাবু, ও তো চৌধুরী সাহেবকা আপনা লেড়কা নয়।

বিমান কিষণলালের কথায় হো হো করে হেসে ওঠে। বলে, দূর বেটা, আজ ভাঙের মাত্রাটা একটু বেশী করেছিস বুঝি ?

নেহি, নেহি ছোটবাবু। আপনারা জানেন না। কোই জানে না, লেকিন্ হনুমানজীর কিরিয়া নিয়ে বলছি সত্যিই ও চৌধুরী সাহেবকা লেড়কা নয়।

তবু হাসতে হাসতেই বিমান শুধায়, তবে কার লেড়কা ?

তা কেউ জানে না। আমি জানি এতটুকু বাচ্চা যখন ছিল চৌধুরী সাহেবের এক ভাই অচিন্ত্যবাবুই তো ওকে গেটের ধারে কুড়িয়ে পেয়েছিল।

প্রসূনও পাশেই ছিল বসে। সে বলে, সত্যি বলছো দরোয়ান ?

একদম বিলকুল সাচ্ বলছি বাবু। চৌধুরী সাহেবকা লেড়কা ও নয়।

দুই বন্ধু এবার পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

বিমান একটু পরে আবার শুধায়, ও তবে কুড়িয়ে পাওয়া ?

হ্যাঁ বাবু, আজ থেকে বাইশ সাল পহলে—দরোয়ান একে একে সব বলে গেল।

দুই বন্ধু গভীর মনোযোগ সহকারে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনল।

তারপর একসময় বিমান দরোয়ানকে বিদায় দিয়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করে। এবং মৃদুকণ্ঠে কতকটা যেন আত্মোক্তির মতোই বলে, আশ্চর্য! আশ্চর্য!

॥ তেরো ॥

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা গৌরী যখন হাসপাতালের ডিউটির পর বেরুচ্ছে,—বিমান এসে সামনে দাঁড়ালো।

গুড্ ইভনিং, মিস্ চ্যাটার্জী!

গুড্ ইভনিং!

গৌরী বিমানকে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করে কিন্তু বিমান দু' পা এগিয়ে এসে পথরোধ করে বলে, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল যে মিস্ চ্যাটার্জী।

ভ্রূ কুঁচকে তাকালো গৌরী বিমানের মুখের দিকে।

মৃদু হেসে বিমান বলে, অবিশ্যি কথাটা আপনার সম্পর্কেই।

আমি একটু ব্যস্ত আছি, বিমানবাবু।

ব্যস্ত আমিও, তবে কথাটা অত্যন্ত প্রয়োজন বলেই—

বেশ, বলুন।

এইখানেই শুনবেন?

হ্যাঁ, বলুন।

কোন নির্জন জায়গায় বসে শুনলে হতো না? বলছিলাম কি কথাটা rather delicate—

না, আপনি এখানেই বলুন। বিরক্তকণ্ঠে বলে এবার কথাটা গৌরী।

শুনলাম প্রদীপ চৌধুরীর সঙ্গে আপনার বিয়ে হচ্ছে।

শুধু ঐটুকুই শুনেছেন, শোনেন নি, পরশু আমাদের বিয়ে?

কিন্তু প্রদীপ চৌধুরীকে বিয়ে করবার আগে তার সম্পর্কে একটু ভাল করে খোঁজ-খবর নিলে বোধহয় আপনি ও আপনার বাবা বুদ্ধিরই পরিচয় দিতেন।

মিঃ রায়, যদি আপনার কথা শেষ হয়ে থাকে তো আমি এবার যাবো।

যাবেন বৈকি। কিন্তু কথাটা হয়ত আপনি জানেন না—

আপনি তো জানেন, প্রদীপের সঙ্গে আমার পরিচয় আজ তিন বছরের।

তাই তো বলছিলাম ব্যাপারটা একটা নিখুঁত প্রতারণা।

প্রতারণা!

হ্যাঁ, আপনি কি জানেন তার জন্ম-পরিচয়?

বিমানবাবু!

জানেন কি তার জন্মের ঠিক নেই—তার—

কথাটা বিমানের শেষ হলো না, সহসা একটা প্রবল চপেটাঘাত এসে বিমানের গালে পড়লো সশব্দে।

বিমানের গালে চড়টা বসিয়ে দিয়ে মুহূর্তমাত্রও আর সেখানে দাঁড়ালো না গৌরী, হনহন করে স্থান ত্যাগ করে চলে গেল।

ভুলেই গিয়েছিল বুঝি ব্যাপারটা গৌরী।

বিমানের কথাটা বুঝি ভুলেই গিয়েছিল।

ঘরের মধ্যে ইন্দ্রাণীর মতই সেজে রক্তলাল-বেনারসী পরে বসে ছিল গৌরী বধূ-বেশে।

উমা নিজের হাতে গৌরীকে সাজিয়ে দিয়েছিল।

রাত নয়টায় লগ্ন।

বন্ধুদের নিয়ে প্রদীপ এসে গিয়েছে।

চারিদিকে বিয়েবাড়িতে হৈ চৈ গোলমাল।

সানাই বাজছে।

কন্যা সম্প্রদান করতে বসেছেন কৃষ্ণকান্ত।

প্রদীপের হাতে গৌরীর হাত তুলে দিয়ে সবে মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করেছেন, বিবাহ আসরে বিমান এসে ঢুকলো আকণ্ঠ মদ্যপান করে।

কৃষ্ণকান্তবাবু, এক মিনিট দাঁড়ান—

বিমানের কণ্ঠস্বরে সহসা যেন বিবাহ-বাসরের যাবতীয় লোকের দৃষ্টি গিয়ে বিমানের 'পরে পড়লো।

কে তুমি? কৃষ্ণকান্তবাবু শুধালেন।

আমার পরিচয় পরে নেবেন কিন্তু তার আগে যার সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিতে চলেছেন—ঐ প্রদীপ চৌধুরীর সত্যকারের পরিচয়টা কি আপনি জানেন?

সকলে বিস্ময়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে তখন।

সভায় উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে।

কে একজন মন্তব্য করে, কে হে লোকটা?

বিমান বলে, ব্যারিস্টার হিমাদ্রি চৌধুরীর ছেলে ভেবে যার সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দিতে আপনি চলেছেন, জানেন কি ও ব্যারিস্টার চৌধুরীর ছেলে নয়?

প্রদীপ এতক্ষণ বসে ছিল, সে এবার বিয়ের পিঁড়ি ছেড়ে বরের জোড় পরেই উঠে সোজা এগিয়ে আসে বিমানের সামনে।

বিমানবাবু!

Yes, Dr. Pradip Chaudhury, আপনি ব্যারিস্টার চৌধুরীর ছেলে নন।

বাঘের মতই থাবা দিয়ে টাইসমেত কলারটা বিমানের চেপে ধরে বলে প্রদীপ. You rascal, উড়ো চিঠি তাহ'লে তুমিই দিয়েছিলে আমার মাকে, এখন বুঝতে পারছি—now tell me—why you have started this dirty game!

ছাড়ুন, ছাড়ুন মশাই, কি হচ্ছে!—টাইটা প্রদীপের বজ্রমুষ্টি থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বিমান বলে।

ছাড়বো, তোমাকে আজ আমি খুন করে তবে ছাড়বো।

আহা, তা না হয় করবেন কিন্তু তাতে করে হিমাদ্রি চৌধুরীর ছেলে বলে তো স্বীকৃতি আপনি পাবেন না।

আবার!

একটা ঝাঁকুনি দেয় প্রদীপ বিমানকে।

শুনুন মশাই, শুনুন—হিমাদ্রি চৌধুরীর ছেলে আপনি নন। আপনাকে, আমারই পাশে এই—এই যে বুড়ো দরোয়ানটা দাঁড়িয়ে আছে, এ-ই জানে, আপনার এক কাকা অচিন্ত্যবাবু আপনাকে একদিন চৌধুরীবাড়ির গেটে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। তাছাড়া আপনার মাকে জিজ্ঞাসা করলেই তো সত্য-মিথ্যা জানতে পারবেন। চলুন না হয় আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।

বিবাহ সভায় ততক্ষণে রীতিমত একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে।

নানা ধরনের মন্তব্য নানা দিক থেকে শুরু হয়েছে।

কৃষ্ণকান্তবাবু এগিয়ে আসেন। বিহ্বল কণ্ঠে ডাকেন, প্রদীপ!

ফিরে তাকালো প্রদীপ কৃষ্ণকান্তর মুখের দিকে।

এসব কি শুনছি, প্রদীপ? তোমার জাতজন্মের কোন ঠিক নেই? সত্যিই তুমি ব্যারিস্টার চৌধুরীর ছেলে নও?

প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে প্রদীপ কৃষ্ণকান্তকে থামিয়ে দেয়, থামুন।

এতক্ষণ ধরা ছিল মুঠোর মধ্যে বিমানের গলার টাইটা। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বিমানকে ঠেলে ফেলে দিয়ে দরজার দি[illegible]য়ে যায় প্রদীপ।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে ছিল বিয়ের পিঁড়িতে গৌরী।

সে দৌড়ে এসে প্রদীপের পথ রোধ করে, প্রদীপ, কোথায় যাচ্ছো?

গৌরী, গৌরী—তুমি একথা বিশ্বাস করো ?

না।

আমিও না। তবু—তবু একবার আমাকে যেতে হবেই এখুনি মার কাছে। আমি যাবো আর আসবো।

ছুটে বের হয়ে গেল প্রদীপ।

যে গাড়িতে এসেছিল সে বিয়ে করতে, সেই গাড়িতেই উঠে ড্রাইভারকে সরিয়ে নিজে স্টার্ট দিল।

॥ চৌদ্দ ॥

ফুলে লতায় পাতায় আর রঙ-বেরঙের আলোয় চৌধুরীবাড়ি মনে হচ্ছিলো যেন ইন্দ্রপুরী।

গেটের সামনে নহবত বসেছে।

সানাই বাজছিল।

তিন দিন ধরে সানাই বাজবে।

অমিতা নিজের ঘরে একটা চেয়ারের 'পরে চোখ বুজে পড়েছিল।

প্রদীপের বিয়েটা চুকে গেলেই তার জীবনের শেষ কাজ হয়ে যাবে।

লাফাতে লাফাতে দুটো করে সিঁড়ি অতিক্রম করতে করতে সিঁড়ি থেকেই চীৎকার করে ডাকে, মা, মা, মা—

একি! কার গলা! প্রদীপের গলা না!

ধ্বক করে ওঠে অমিতার বুকের ভিতরটা।

প্রদীপ ফিরে এলো কেন হঠাৎ এ সময়!

বিহ্বল বিমূঢ় অমিতা ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারে না।

ঝড়ের মতই যেন পরক্ষণে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো প্রদীপ, মা!

মাথার চুল উস্কখুস্ক। সারা কপাল ব্যেপে তখনো চন্দনের

মাঙ্গলিক চিহ্ন। গলায় যুঁথির গোড়ে তখনো অম্লান। গায়ের চাদরটা লুটোচ্ছে এক পাশে কাঁধ থেকে। দু'চোখে রক্তবর্ণ উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

মা!

কি? কি হয়েছে প্রদীপ?

উদ্বেগে আশঙ্কায় দিশেহারা অমিতা কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায়।

তোমাকে একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে, মা!

কোথায়?

আমি বিশ্বাস করিনি। বলে এসেছি এ মিথ্যা, তবু—তবু—একবার তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে মা।

যেতে হবে! কোথায়?

তুমি যে আমাকে তোমাদের বাড়ির গেটের সামনে কুড়িয়ে পাওনি, শুধু সেই কথাটা একটিবার ওদের জানিয়ে দিতে।

মিথ্যা, মিথ্যা—সব মিথ্যা!—পাগলিনীর মতই চীৎকার করে ওঠে অমিতা।

জানি, আমি জানি—

প্রদীপের মুখের কথা শেষ হলো না, সহসা নীচ থেকে একটা চীৎকার ভেসে এলো, অমিতা, অমিতা!

কে! কে—কে ডাকে?

আবার ডাক ভেসে আসে, অমিতা, অমিতা!

তুমি এসেছো, তুমি এসেছো?—উন্মাদিনীর মতই খোলা দরজার দিকে ছুটে যায় অমিতা।

আঁচলটা তার মাটিতে লুটোচ্ছে।

চীৎকার করে পিছন থেকে ডাকে প্রদীপ, কোথায়—কোথায় যাচ্ছ মা? মা—মা—

অমিতা তখন ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দা পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেছে পাগলের মতই আর চেঁচাচ্ছে, কোথায়, কোথায় তুমি?

সিঁড়ির নীচে তখন ভৃত্যদের প্রহারে প্রহারে জর্জরিত হিমাদ্রি মাটিতে পড়ে ওঠবার চেষ্টা করছে।

ছিন্ন মলিন জামা-কাপড় প্রহারের চোটে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে।

কপাল কেটে রক্ত পড়ছে।

সিঁড়ি দিয়ে টলতে টলতে নামে অমিতা, কোথায়, কোথায় তুমি ?

অমিতা !

ভৃত্যের দল তখন হতভম্ব, চারিপাশে পাথরের মত দাঁড়িয়ে।

প্রদীপও প্রথমটায় হিমাদ্রিকে চিনতে পারেনি।

অমিতা যখন গিয়ে ঝাঁপিয়া পড়ে হিমাদ্রিকে ত্থ'হাতে জড়িয়ে ধরে, প্রদীপ চিনতে পারে তার বাপকে।

বাবা—ওরে এ তোরা কি করেছিস !

অমিতা তখন হিমাদ্রিকে ত্থ'হাতে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে বলে, প্রদীপের কথার জবাব দাও, এক মাত্র তুমি, তুমিই বলতে পারো—

অমিতা !

বলো, বলো তুমি প্রদীপকে আমরা গেটের ধারে কুড়িয়ে পাই নি। বলো ও আমাদের সন্তান। ও তোমার সন্তান—বলো, বলো।

হিমাদ্রি স্তব্ধ পাথর।

রক্তাক্ত মুখে বিহ্বল বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে হিমাদ্রি অমিতার মুখের দিকে।

॥ পনেরো ॥

বিবাহমণ্ডপে যখন প্রদীপকে নিয়ে প্রচণ্ড গোলমাল শুরু হয়েছে অন্দরে দরজার একপাশে পাথরের মত দাঁড়িয়েছিল উমা।

হে ভগবান, শেষ মুহূর্তে একি করলে !

হতভাগিনীর শেষ আশার আলোটুকুও ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে দিলে!

চোখের সামনে যেন সব ছায়াছবির মতই ঘটে গেল!

ঝড়ের মত বের হয়ে গেল প্রদীপ।

স্তব্ধ চারিদিক।

গৌরী টলতে টলতে বিবাহমণ্ডপ থেকে ঘরে চলে এল।

উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি থেমে গিয়েছে।

সানাই থেমে গিয়েছে।

সব থেমে গিয়েছে। মৃত্যুর হিমশীতল স্তব্ধতা যেন নেমে এসেছে চারিদিকে।

অনেকক্ষণ পরে উমা গৌরীর ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো।

ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ।

গৌরী!

মৃদু কণ্ঠে ডাকলো উমা।

কিন্তু সাড়া নেই গৌরীর।

গৌরী!

তবু সাড়া নেই গৌরীর।

গৌরী, দরজা খোল।

এবারে দরজা খুলে গেল।

গৌরীর, দু'চোখে জলের ধারা।

গৌরী!

ঝাঁপিয়ে পড়ে কেঁদে উঠলো গৌরী উমার বুকে, বড়মা—একি হলো বড়মা, একি হলো!

গভীর স্নেহে গৌরীর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে উমা বলে, কিছু হয়নি রে, কিছু হয়নি।

বড়মা!

সব মিথ্যা, সব মিথ্যা।

জলে ভেজা মুখখানা তুলে এবার তাকায় গৌরী উমার মুখের দিকে, সত্যি বলছো বড়মা ?

হ্যাঁ রে সত্যি। অমি যে জানি মিথ্যা।

তুমি জান! প্রদীপ তাহলে ব্যারিস্টার চৌধুরীরই ছেলে ?

হ্যাঁ। শোন্, এখুনি তুই একবার সেখানে যেতে পারবি ?

কোথায় বড়মা ?

প্রদীপের মার কাছে।

প্রদীপের মার কাছে ?

হ্যাঁ। পারবি ?

কিন্তু—

আমি তোকে একটা চিঠি দিচ্ছি সেই চিঠি নিয়ে তুই এখনি যা প্রদীপের মার কাছে। দাঁড়া তুই, আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি—

তাড়াতাড়ি একটা চিঠি লিখে চিঠিটা গৌরীর হাতে দিয়ে উমা বলে, যা আর দেরি করিস না, এখুনি সেখানে যা। বলবি এই চিঠির মধ্যেই প্রদীপের সত্য পরিচয়।

উমা নিজে সঙ্গে করে গৌরীকে দরজার গোড়ায় পৌঁছে দেয়, যা মা। কোন ভয় নেই তোর, যা।

গৌরী বের হয়ে গেল।

দ্রুতপদে রাস্তায় পড়ে হাঁটতে লাগলো।

পাথরের মতই দাঁড়িয়ে তখনো হিমাদ্রি।

অমিতা বলে, জবাব দিচ্ছ না কেন, জবাব দাও। বল—বল—

আমি যে সত্যিই জানি না অমিতা ও কে।

হঠাৎ ঐ সময় অমিতার একটা কথা যেন মনে পড়ে যায়। স্বামীর হাত ধরে বলে, এসো, এসো তুমি আমার সঙ্গে—

স্বামীকে টেনে নিয়ে যায় অমিতা লাইব্রেরী ঘরে, তারপর কাঁপতে কাঁপতে আলমারির পিছন থেকে ছোট একটা চন্দন কাঠের বাক্স বের করে, তার ভিতর থেকে সেই আংটিটা নিয়ে স্বামীর

হাতে তুলে দিয়ে বলে, দেখ তো, দেখ তো—এই আংটিটা চিনতে পারো কি না!

একি! হিমাদ্রি চমকে ওঠে, এ যে আমার আংটি!

তোমার! সত্যি বলছো তোমার আংটি?

হ্যাঁ হ্যাঁ—এ যে আমারই আংটি, আমি উমাকে দিয়েছিলাম—

উমাকে দিয়াছিলে তুমি, উমাকে?

হ্যাঁ—আমার প্রথমা স্ত্রী, গোপনে হাজারীবাগে তাকে আমি বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু দুর্বল আমি, ভীরু আমি—চোরের মতই তাকে ফেলে পালিয়ে এসেছিলাম—কোথায়, কোথায় উমা?

উমা তোমার স্ত্রী—প্রদীপ তোমার সন্তান—কথাটা বলতে বলতে টলে পড়ে যাচ্ছিলো অমিতা। কিন্তু তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বিহ্বল হিমাদ্রি অমিতাকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে ওঠে, অমিতা, অমিতা—

অমিতার চোখ দুটো তখন বুজে গিয়েছে, স্বামীর বুকে মাথাটা হেলে পড়েছে।

অমিতা, অমিতা—

অতিকষ্টে যেন তাকালো অমিতা। ক্ষীণ, অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, তাকে ফিরিয়ে এনো। যেখান থেকে পারো তাকে খুজে ফিরিয়ে এনো—

অমিতা—

ব'লো তাকে যেদিন থেকে মনে আমার সন্দেহ জেগেছে, তার স্বামীকে আমি স্পর্শও করিনি। তার স্বামী—তারই—

প্রদীপ, তোমার মা, মা কোথায়? ছুটতে ছুটতে এসে গৌরী ঘরে ঢুকলো আলুথালু বেশে ঐ মূহূর্তে।

কে রে? ক্ষীণ কণ্ঠে শুধায় অমিতা।

আমি গৌরী। গৌরী এগিয়ে আসে, বড়মা আপনাকে চিঠি দিয়েছেন, বলেছেন এই চিঠিতেই প্রদীপের সব পরিচয় আছে—

দেখো, দেখো কি লিখেছে। এ নিশ্চয়ই সে। কই, কই চিঠি—হাত বাড়ায় অমিতা।

হাতটা কাঁপছে অমিতার।

চিঠিটা অমিতার কম্পিত হাতে তুলে দেয় গৌরী।

ঘরের মধ্যে সব নিশ্চল নির্বাক।

পড় তো পড় তো কি লিখেছে সে—

হিমাদ্রিকে অনুনয় করে অমিতা।

হিমাদ্রি যন্ত্রবৎ চিঠিটা হাতে নেয়। কিন্তু হিমাদ্রি পরক্ষণে চিঠিটা গৌরীর হাতে তুলে দিয়ে বলে, তুমিই পড়।

গৌরীই চিঠি পড়ে।

অমিতা,

অভাগিনী আমিই প্রদীপের মা। তোমার স্বামীরই সন্তান প্রদীপ। প্রদীপের জন্মের মধ্যে কোন পাপ নেই—আমি তার বিবাহিতা স্ত্রী।

—উমা

জানতাম, আমি জানতাম! অমিতা বলে, যাও, যাও—এখনো তুমি বসে আছো। যাও তাকে নিয়ে এসো। নিয়ে—এ—সো—

বলতে বলতে অমিতার মাথাটা স্বামীর কোলে ঢলে পড়লো।

হিমাদ্রি বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল অমিতার, মৃতা অমিতার শান্ত মুখখানার দিকে।

তারপর একসময় সহসা দু'হাতে অমিতার মৃত্যুশীতল মুখখানা ধরে বলে উঠে, কিন্তু আমার যে তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়া হলো না অমিতা! আমার যে ক্ষমা চাওয়া হলো না! বলো, বলে যাও তুমি আমাকে ক্ষমা করেছো! আমাকে ক্ষমা করেছো!

প্রদীপের চোখে জল।

গৌরীর চোখে জল।

॥ সমাপ্ত ॥